লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ১২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ পৌষ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ২৭ সফর, ১৪৩৪ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্, ১৩৯২ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩ ঈসাব্দ

১০০ ১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all Hatred for none

বিশ্বের সর্ববৃহৎ মানব-পতাকা তৈরি করে রেকর্ড গড়ল বাংলাদেশ

১৬ ডিসেম্বর রাজধানীর শেরেবাংলা নগড়ের জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড দুপুর ১ টা ৩৫ মিনিটে ছেয়ে যায় লাল আর সবুজে। খণ্ড খণ্ড লাল-সবুজ এক করে একই পতাকার সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল হাজারো বাঙালি। ২৭ হাজার ১১৭ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষার্থী, তরুণ, সাধারণ মানুষ ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মিলে তৈরি করেন বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই মানব পতাকা।

এতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**। **বইটির মূল্য ৬০/- (ষাট টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন**।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির ইতিহাসে গৌরবোজ্জল ১৬ ডিসেম্বর

আবার ফিরে এসেছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচাইতে গৌরবোজ্জল দিন ১৬ ডিসেম্বর-মহান বিজয় দিবস। ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মদানে মুক্ত স্বদেশে আজ উদযাপিত হতে যাচ্ছে বিজয়ের ৪২তম বার্ষিকী। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে হর্ষোৎফুল্ল এক বিশাল জনতার সামনে, আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করলেন পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ইস্টার্ন কমান্ডারের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী। পাকবাহিনীর এই আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরদান মানেই তো যুদ্ধের বিজয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বিজয়ের স্মারক হিসেবে ১৯৭২ সাল থেকেই আমরা প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয়' দিবস পালন করে আসছি। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে আর এরকম দ্বিতীয় কোন বিজয় দিবস নেই।

সমগ্র জাতি এই মাসে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের কথা, দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে যারা পরাক্রমশালী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতার সূর্য পতাকা ছিনিয়ে এনেছিল। ঐ বিজয়ের পিছনে ছিল কোটি কোটি মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় ও অকুণ্ঠ সমর্থন।

আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর আমাদের বিজয় দিবসকে স্মরণ করে। এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে তা বিশ্ববাসী উপলব্ধি করতে পারছে। ভাষা সৈনিক সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার এর আত্মদান আর একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদ ও তিন লাখ মা বোনের ইজ্জত হারানো শাশ্বত এ বাঙ্গালীর রক্তের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠা বাংলাদেশ, আজ বিশ্ব-দরবারে স্বীয় মর্যাদায় মাথা উঁচু করে নিজ অস্তিত্বে দেদীপ্যমান। আমরা চাই যে লক্ষ্যে এদেশকে আমরা স্বাধীন করেছি তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। আজ সময়ের দাবী সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শাণিত করে সকল অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতার মূল্যবোধকে সব কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরি। তবেই না আমাদের এই বিজয় দিবস পালন স্বার্থক হবে।

বিজয় দিবসের আনন্দ হোক চির অম্লান
জয় হোক চির সত্যের

কাদিয়ান দারুল আমান-এর ১২২তম সালানা জলসা মুবারক হোক

আগামী ২৭, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৩, ইন্ডিয়ার কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১২২তম সালানা জলসা।

২৯ ডিসেম্বর রবিবার, জিএমটি সময় সকাল ১০:৩০ মিনিটে লন্ডন থেকে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এমটিএ-র মাধ্যমে সরাসরি জলসার সমাপ্তি বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করবেন।

জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। সেই সাথে জলসার সফলতার জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

-সম্পাদক

সূচিপত্র

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃত বাণী	৫
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (১৮ অক্টোবর ২০১৩)	৬
বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)	১৪
একজন কলাম সৈনিকেরঅন্তিম যাত্রা	২২
তৌহিদ প্রচার ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) খন্দকার আজমল হক	২৪
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	২৮
আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি জাফর আহমদ	৩১
স্বাধীনতা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নিয়ামত মাহমুদ আহমদ সুমন	৩৪
হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং কিছু কথা মুহাম্মদ আমীর হোসেন	৩৭
সংবাদ	৪১
আপনার সন্ধানে আছি!	৪৩
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪৪

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন।

ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে
'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

বিজ্ঞপ্তি

মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ
৩৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা স্থগিতকরণ

বিশেষ পরিস্থিতির কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের ৩৬তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা ২০১৩ স্থগিত করা হয়েছে।

পরিবর্তিত তারিখ হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে যথাসময়ে জানানো হবে, ইনশাআল্লাহ্!

পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সকরুন দোয়ার জন্য সকলকে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ তা'লা সকলের সহায় হোন।

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্
সদর
মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ১০০ আয়াত এবং ৬ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ②

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ③

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ④

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার কৃপাকারী।

২। আনাল্লাহু আরা অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌। আমি দেখি। এগুলো (এক) পরিপূর্ণ কিতাব এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত[১৪৭৬]।

৩। যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! তারাও যদি মুসলমান হতো[১৪৭৭]।

৪। তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও যেন তারা খায়-দায় ও সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নেয় এবং যেন বৃথা আশা আকাঙ্ক্ষা[১৪৭৮] তাদেরকে ভুলিয়ে রাখে। তবে অচিরেই তারা (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

১৪৭৬। কেবলমাত্র সূরা নামলের ২য় আয়াতে এবং এই তফসীরাধীন আয়াতে 'কিতাব' এবং 'কুরআন' শব্দদ্বয় এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আয়াতে 'কিতাব' শব্দ প্রথমে এবং 'কুরআন' শব্দ পরে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা নামলে শব্দদ্বয় উল্টাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ 'কুরআন' প্রথমে এবং 'কিতাব' পরে ব্যবহৃত হয়েছে। কিতাব শব্দ এই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে ইঙ্গিত করেছে যে ইসলামের এই পবিত্র গ্রন্থ লিখিত আকারে প্রকাশ হতে থাকবে। আর কুরআন শব্দ এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি নির্দেশ করেছে যে এটা ক্রমবর্ধিতভাবে পঠিত ও পুণরাবৃত্ত হতে থাকবে। এছাড়া কুরআনে 'সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী' 'কুরআন' শব্দদ্বয় মাত্র দু'বার ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী' 'কিতাব' শব্দ দু'টি কমপক্ষে ১২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লিখিত বিবরণী বা প্রমাণ মৌখিক কথা-বার্তার আদানপ্রদান থেকে অধিকতর কার্যকর। অতএব মুসলমানদের শিক্ষার্জনের প্রতি এবং লিখিত জ্ঞান অন্বেষার প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা উচিত।

১৪৭৭। লিখিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) এর সময়ে অবিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকে এইরূপ অভিযোগ প্রকাশ করেছিল।

১৪৭৮। এই আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত অবিশ্বাসীদের যে ধারণা- তারা মুসলমান হয়ে গেছে- তা এক বৃথা আশা অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব উপভোগ সাধন এবং বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করা।

হাদীস শরীফ

এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই

১। হযরত উমর (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের ভাই। সে অন্যের প্রতি যুলুম করে না এবং তাকে অন্যের হস্তে (যুলুমের উদ্দেশ্যে) সমর্পণ করে না; যে তার ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। যে কেউ মুসলমানের কষ্ট দূর করে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। যে কেউ মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিনে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হযেছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আর এক মুলমানের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করে না। তাকে লাঞ্ছিত করে না এবং তাকে ঘৃণা করে না। (বুকের ভিতরের দিকে তিনবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন) তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) এখানে। এক মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করা একজনের জন্য যথেষ্ট অন্যায়। প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, সম্পত্তি এবং সম্মান অন্য একজন মুসলমানের নিকট পবিত্র। (মুসলিম)

৩। হযরত মুস্তাওবেদ (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অপর এক মুসলমানের গ্রাস আত্মসাৎ করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় ওটার অনুরূপ তাকে দোযখ হতে আহার করাবেন। যে কেউ এক মুসলমানের কাপড় (ছিনিয়ে নিয়ে নিজে পড়ে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে ওটার অনুরূপ দোযখ হতে পড়াবেন; এবং যে কেউ অন্যের সম্মানহানি করে, কেয়ামতের দিনে আলল্লাহ্ তার সম্মানহানি করবেন। (আবুদাউদ)

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্নিত আছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ নিশ্চয় তোমরা একে অন্যের জন্য দর্পণ-স্বরূপ। সে যদি তাতে কোন ধূলি দেখে, নিশ্চয় সে তা ঝেড়ে দেয়। (তিরমিযী)। এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর জন্য দর্পণ স্বরূপ এবং এক বিশ্বাসী আর এক বিশ্বাসীর ভাই; সে তার ক্ষতি প্রতিহত করে এবং তার পশ্চাৎ হতেও রক্ষা করে। (আবু দাউদ তিরমিযী)

৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুসলমান, যে সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল', তিনটি কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। এক-বিবাহের পর ব্যভিচার করলে তাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করতে হবে, দুই-আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে, অথবা ফাঁসি দিয়ে মারবে অথবা দেশ হতে বহিষ্কার করে দিতে হবে, তিন-সে কোন মানুষকে হত্যা করলে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করতে হবে। (আবুদাউদ)

৬। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ একজন মুসলমানের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবীর বিলোপ সাধন আল্লাহ্র দৃষ্টিতে অবশ্যই সহজ।

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন ঃ দুই বান্দা, একজন পূর্বের এবং অপর একজন পশ্চিমের। যদি মহিমান্বিত আল্লাহ্র জন্য পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদেরকে একত্রিত করে বলবেন, এ সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার জন্য ভাল বেসেছিলে। (বায়হাকী)

অনুবাদঃ ***মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ***
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

অমৃতবাণী

কুৎসা রটনা এক জঘন্য পাপ, যা ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

অন্যায় সন্দেহ (বদযন্নি) এক মারাত্মক আপদ। এটা শীঘ্র ঈমানকে ভস্মীভূত করে, যেভাবে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা শুষ্ক খড় ও তৃণকে ভস্মীভূত করে থাকে। যে ব্যক্তি খোদার প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, খোদা স্বয়ং তার শত্রু হয়ে যান এবং এরূপ ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হন। তিনি তাঁর মনোনীত পুরুষদের সম্মান সম্বন্ধে এমন মর্যাদাবোধ পোষণ করেন যে, কারও মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যায় না। যখন আমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার মোকদ্দমা আনয়ন করা হয়েছিল, তখন খোদার সেই মর্যাদাবোধ আমার জন্য উদ্বেলিত হয়েছিল। *(রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)*

আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, কুৎসা রটনা করা এক জঘন্য পাপ, যা ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়, সত্য হতে অনেক দূরে নিয়ে যায় এবং বন্ধুত্বকে শত্রুতায় পরিণত করে দেয়। সিদ্দিকীয়তের মর্যাদা লাভের জন্য কুৎসাকে পরিহার করা আবশ্যক। যদি ভুলবশতঃ কেউ কুৎসা করে ফেলে, তাহলে সে যেন অনুতপ্ত হয়ে খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থী হয় এবং দোয়া কতে থাকে যে, আগামীতে যেন এমেন মন্দ কাজ তার দ্বারা না হয়। খোদা যেন তাকে এরূপ ব্যভিচার হতে রক্ষা করেন। এ আধ্যাত্মিক ব্যাধিকে কেউ যেন হালকা করে না দেখে। এটা অত্যন্ত ভয়ানক এক ব্যাধি, যা ধীরে ধীরে আক্রান্তকারীকে ধ্বংস করে দেয়। *(মলফুযাত, ১ম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)*

তোমাদের উচিৎ, সহানুভূতি ও চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা তোমরাও 'রূহুল কুদুস'-এর 'ঐশী আশিসের অংশ' লাভ কর। কারণ রূহুল কুদুস ব্যতীত প্রকৃত তাক্ওয়া লাভ হয় না। প্রবৃত্তির বশবর্তিতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই পথ অবলম্বন কর, যা অপেক্ষা কোন পথই সংকীর্ণতর নয়। দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মুগ্ধ হয়ো না, কারণ এটা খোদা হতে দূরে নিক্ষেপ করে। খোদার নিমিত্তে কঠোর এবং বিষাদময় জীবন অবলম্বন কর। যে দুঃখ-ব্যাথায় খোদা সন্তুষ্ট হন, তা সেই সুখ-সম্ভোগ অপেক্ষা উত্তম, যার ফলে খোদা অসন্তুষ্ট হন। যে পরাজয়ে খোদা সন্তুষ্ট হন, তা সেই বিজয় অপেক্ষা উত্তম, যার দরুন খোদার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়। সেই প্রেম পরিহার কর যা খোদার ক্রোধের নিকটবর্তী করে।

যদি তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হও, তবে তিনি সকল দিক দিয়েই তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং কোন শত্রু তোমাদের অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। *(রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা)*

খোদা তা'লা কুরআন শরীফে তাক্ওয়াকে 'পোষাক' বলে অভিহিত করেছেন। 'লেবাসুত্ তাক্ওয়া' কুরআন শরীফের শব্দ, যা এদিকে ইঙ্গিত করে থাকে যে, আধ্যাত্মিক-সৌন্দর্য ও শোভা তাক্ওয়া দ্বারাই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অঙ্গীকার এবং অনুরূপভাবে সৃষ্টির সকল আমানত ও কর্তব্যকে যথাসম্ভব পূর্ণ করবে, অর্থাৎ-এর সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম রীতিকেও যথাসম্ভব পালন করবে *(রূহানী খাযায়েন, ২১ খন্ড, ২১০ পৃষ্ঠা)*।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কিন্তু মাত্র সেই ব্যক্তিই তাঁর আশ্চর্যলীলা দর্শন করতে পারে, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তাঁর শক্তিতে দৃঢ়-বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নয় এবং তাঁর আশ্চর্যলীলাসমূহ প্রদর্শন করে না, কত হতভাগ্য সে-ব্যক্তি। যে আজও জানে না যে, তার এরূপ এক খোদা আছেন, যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, ২০ পৃষ্ঠা)*

জুমুআর খুতবা

তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করে থাক এবং তোমরা আল্লাহতে ঈমান রেখে থাক।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়ায় প্রদত্ত ১৮ অক্টোবর ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

وَقُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ۝٥٤

অর্থাৎ "এবং তুমি আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন সে কথাই বলে, যা সবচেয়ে ভাল। নিশ্চয় শয়তান তাদের মাঝে ফেৎনা সৃষ্টি করে, শয়তান নি:সন্দেহে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৪)

অনুবাদে আপনারা শুনেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে বলেছেন, তারা যেন ভাল কথা বলে। প্রথম কথা হলো ভাল কথা সেটা, যা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ভাল। এজন্য আল্লাহ্ 'এবাদি'-'আমার বান্দা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ শব্দ দ্বারা আমাদেরকে বেঁধে দিয়েছেন যে, যারা আমার বান্দা বা যারা আমার বান্দা হতে চায়, তারা এখন আর বল্গাহীন থাকছে না যে তারা যা ইচ্ছা করবে, তারা এখন নিজেদের ইচ্ছা-আকঙ্খা ছেড়ে দিয়ে আমার ইচ্ছার অনুসরণ করবে। তারা এখন ভাল কিছু খুঁজবে, ভাল কথা অর্থাৎ এমন কথা যা আল্লাহ্‌র পছন্দের কথা, তা খুঁজবে। আরো স্পষ্ট করে সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝١٨٧

অর্থাৎ "আর, আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন (বল), নিশ্চয় আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান রাখে, যাতে তারা সঠিক পথ পায়।" (সূরা বাকারা : ১৮৭)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'এবাদি' (আমার বান্দারা) শব্দের ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন, "যারা আল্লাহ্ তা'লা ও রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস রাখে, তারা 'এবাদি'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং এবাদি-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের অবস্থান আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যে, আর যারা ঈমান আনে না তারা আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে" (জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ: ১৪৬)।

সুতরাং প্রকৃত 'এবাদি' হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তারা

যেন আমার সব আদেশ পালন করে এবং নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করে। যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন সব ধরনের পুণ্য অর্জনকারী হয়ে যাবে, দোয়া কবুল হবে। সুতরাং যখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে আমার বান্দারা সেসব কথা বলুক এবং সেসব কাজ করুক যা আমার নিকট পছন্দনীয়, তখন অবশ্যই নিজ ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশের অনুসন্ধান করতে হবে। নিজেদের আমলকে এমনভাবে সাজাতে হবে তা যেন আল্লাহ্ তা'লার নিকট ভালো, সর্বোত্তম এবং সুন্দর বিবেচিত হয়। এমন হলে চলবে না যে আমাদের কথা একরকম এবং কাজ অন্যরকম। আমাদের আমল তো আল্লাহ্ তা'লার আদেশের পরিপন্থী, কিন্তু অন্যদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ অনুযায়ী চলার নসিহত করছি। আল্লাহ্ তা'লা কথা ও কাজের এমন বৈপরিত্যকে 'গুনাহ' আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু লিমা তাকুলুনা মা লাতাফআলুন, কাবুরা মাক্তান ইন্দাল্লাহি আন তাকুলু মা লাতাফআলুন" (সূরা আসসাফ:৩-৪)

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এটা বড় পাপ যে, তোমরা যা বল তা কর না।

সুরতাং কথা ও কাজের স্ববিরোধিতা আল্লাহ্ তা'লা খুবই অপছন্দ করেন বরং তা পাপও। একদিকে ঈমানের দাবী অপর দিকে আচরণে দ্বৈততা। এ দু'টি একত্রিত হওয়ারই নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "তোমরা আমার কথাটি শুনে রাখ আর ভালভাবে স্মরণ রেখো, কারো কথা যদি অন্তর থেকে না হয় এবং তাতে নিজ কর্মের বাস্তব প্রতিফলন না থাকে তবে তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না" (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, রাবওয়া ২০০৩, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩)।

বক্তব্যও হবে সঠিক আর যে ব্যক্তি বলছে বক্তব্যের সাথে তা নিজের কাজ-কর্মেরও মিল থাকতে হবে যদি তা না হয় তাহলে এথেকে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। সুতরাং "কুলুল্লাতি হে ইয়া আহসান" অর্থাৎ সেই কথাই বল যা উত্তম।

কোন ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিতে নয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে উত্তম হতে হবে। নেকীকে সম্প্রসারণ করবে, মন্দকে প্রতিরোধ করবে। কেউ নিজস্ব পছন্দের যে কথাই বলবে আর এতে স্ববিরোধিতা না থাকলেই সে মু'মিন হয়ে গেছে, এমন নয়। একজন মদ্যপানকারী বলবে যে, আমি মদ পান করি তুমিও পান কর, কারণ আমি যা বলি তাই করি। এটি তো না নেকী হবে আর না উত্তম কথা বরং এটি পাপই হবে ।

এখানকার বর্তমান-সমাজে আমরা দেখছি, স্বাধীনতার নামে কত বেশী নির্লজ্জ আচরণ করা হয় আর তা করা হয় প্রকাশ্যে দিবালোকে। টেলিভিশনে, ইন্টারনেটে, খবরের কাগজে লজ্জাস্কর বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। ফ্যাশন শো এবং পোশাক শো-এর নামে উলঙ্গপনা শেখানো হয়। অবশ্য তাদের কথা ও কাজ একই রকম হয়। কিন্তু খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এটি অপছন্দনীয়, পাপ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত। সুতরাং কিছু মানুষ এবং যুবকরা এসবে প্রভাবিত হয়ে পড়ছে যে এরা তো নীতিবান লোক, যা বলে তাই করে, যা প্রকাশ করে ভেতরেও তাই, এখানে তো দ্বৈততা নেই। এরা যেন স্মরণ রাখে যে, ওদের মধ্যে দ্বৈতনীতি না থাকলেও এতে কোন নেশা নেই। বরং তারা লজ্জা-শরম পরিত্যাগ করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে এবং এটি আল্লাহ্‌র থেকে দূরে সরে যাওয়া।

সুতরাং এ সমাজে অবস্থানকারী নারী-পুরুষদের নিজেদেরকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ। আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত হয়ে সর্বদা 'এহ্‌দেনাস সিরাতাল মুস্তাকীমের' (হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সরল সোজা পথে পরিচালিত কর) দোয়ায়রত থাকা উচিৎ, শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া করা উচিৎ।

আল্লাহ্ একজন মু'মিনের কাছে আশা করেন, যে সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন–তা অনুসন্ধান করা হবে। ঐসব উত্তম কর্মের সন্ধান পাওয়ার জন্য বড়ই চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানো উচিৎ, যাতে করে আল্লাহ্ তা'লা দয়া করে নিজ বান্দাদেরকে তাঁর নৈকট্যের পথ প্রদর্শন করেন, তাঁর সন্তুষ্টির পথ দেখান। বান্দাদের পুণ্যকর্মে খুশী হয়ে বান্দার কথা ও কাজের মাঝে ঐক্য লক্ষ্য করে তাদেরকে পুরস্কারের অংশীদার বানান। এসব কথা জানতে হলে একজন মু'মিনকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ খুঁজতে হবে, যেন সে জানতে পারে যে, উত্তম এবং মন্দের পার্থক্য কি? ওসবের সত্যতা জানতে পারে এবং ঐসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা 'এবাদি' (আমার বান্দা) বলে সম্বোধন করেছেন। তাদের দোয়া কবুলের সুসংবাদ তাদেরকে দিয়েছেন। আমাদের আহমদীদের ওপর এ যুগে অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কারণ আমরা যুগ-ইমামকে মান্য করেছি। প্রতিজ্ঞা করেছি, আমরা আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখব–আমরা এমন প্রত্যেকটি কাজ করব এবং করতে সচেষ্ট থাকব যা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আহসান বা উত্তম। আমাদের কথা ও কাজের মাঝে মিল থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা বর্ণিত সর্বোত্তম কথা জানতে আমরা কুরআন শরীফের দিকে ফিরে যাব, যেখানে শত শত সর্বোত্তম আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সর্বোত্তম এমন বিষয়গুলোর পার্থক্যও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। এটা বলা হয়েছে যে, এই এই কাজ করলে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের পথ লাভ করবে আর এই এই কাজ করলে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে।

কিছু বিষয় আমি এখন চিহ্নিত করছি। যেমন আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ "তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাক এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করে থাক এবং তোমরা আল্লাহতে ঈমান রেখে থাক।" (সূরা আল ইমরান : ১১১)

আল্লাহ্ তা'লা এখানে নিজের বান্দাদের অর্থাৎ 'এবাদুর রহমান'এর মর্যাদা অর্জনকারীদের জামাতকে সব মানুষের চেয়ে উত্তম জামা'ত আখ্যা দিয়েছেন। কেন ভাল? এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'লার বর্ণিত পথনির্দেশনা অনুসারে 'সর্বোত্তম' অর্থাৎ 'আহসান'-কে নিজের কথা ও কাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এজন্য উত্তম সে-ই ব্যক্তি, যে নেক কাজের পথ দেখায়। প্রবৃত্তির অনুসরণের পরিবর্তে সেই হেদায়েতের অনুসরণের ওপর জোর দেয়, যা আল্লাহ্ তা'লা নিজের নৈকট্য অর্জনের জন্য দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা এজন্য 'খায়রে উম্মত' যে, তোমরা পাপ থেকে বিরত থাক প্রত্যেক গুনাহ এবং অসৎ কাজ থেকে নিজে বিরত থাক এবং অন্যদেরকে

বিরত থাকার উপদেশ দাও, যেন আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে পার। এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তোমাদের ঈমান দৃঢ় এজন্য তোমরা 'খায়রে উম্মত' বা সর্বোত্তম উম্মত। তোমরা এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে তোমাদের সব কথা ও কাজকে আল্লাহ্ তা'লা দেখছেন। তোমরা এই ঈমানে প্রতিষ্ঠিত থেকো যে পৃথিবীর অস্থায়ী-প্রভু আমাদের প্রয়োজনগুলোকে পূর্ণ করছে না, বরং খোদা তা'লা, যিনি 'রাব্বুল আলামীন', তিনি আমাদের প্রয়োজনগুলোকে পূর্ণ করেন এবং আমাদের দোয়া শ্রবণ করেন। এরপর গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটি তুমি পৃথিবীকে জানিয়ে দাও যে তোমাদের স্থায়ীত্ব আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক তৈরী করায় এবং তাঁর আদেশাবলীর ওপর আমল করার মাঝে নিহিত, সুখ-স্বাচ্ছন্দের ওপর নয়। অত:পর আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে সর্বোত্তম কথা এবং পাপ ও পুণ্যের আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

যেমন সূরা ফুরকানের ৭৩ নম্বর আয়াতে বলেন, "আর (তারাও রহমান আল্লাহ্‌র বান্দা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং তারা যখন অযথা বিষয়ের সম্মুখীন হয় তখন তারা গাম্ভীর্যের সাথে পাশ কাটিয়ে যায়, এখানে দু'টি বিষয় থেকে বারন করা হয়েছে। একটি মিথ্যা এবং অপরটি অযথা বিষয়। অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। বরং অপর এক জায়গায় বলেছেন, তোমাদের সাক্ষ্যের মাপকাঠি এমন হওয়া উচিত, যদি নিজের অথবা পিতা-মাতা কিংবা অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়, দাও। সুতরাং এটাই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি। এই মাপকাঠিতে প্রতিষ্ঠিত হলে সে 'সর্বোত্তম' হিসেবে বিবেচিত হবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা 'সর্বোত্তম' বলেছেন। এর ফলশ্রুতিতে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হয়, পুণ্যার্জনে আরো বেশী উন্নতি করে এবং সেসব লোকদের মাঝে গণ্য হয়, যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা।

অত:পর আল্লাহ্ তা'লা সত্যবাদিতা সম্পর্কে আরো বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এং সহজ-সরল কথা বল। (সূরা আল-আহযাব: ৭১) এটা সেই 'সত্যবাদীতার' মানদন্ড, যেটি করার এবং বিস্তৃতি দানের আদেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন। কিন্তু যদি আমরা আত্মপ্রর্যালোচনা করি, তাহলে সত্যবাদীতার এই মানদন্ড চোখে পড়ে না।

প্রত্যেক পদক্ষেপে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা সামনে এসে যায়। যদি আমরা পর্যালোচনা করি, আমাদের মাঝে কয়জন এমন আছেন, যারা প্রয়োজনের সময় নিজের বিরুদ্ধে, নিজের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে এবং প্রিয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত? এবং এমন মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেন যে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তা, ব্যবসায়িক লেন-দেনের বিষয়গুলোতে সব ধরনের প্যাঁচানো কথাবার্তা থেকে মুক্ত থাকে? কোথাও না কোথাও হয় ব্যক্তিগত স্বার্থ বাধা হয়ে দাঁড়ায় অথবা নিকটজনদের স্বার্থ বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

অথবা অহংকার বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং ভুল স্বীকার করতে প্রস্তুত হয় না। এমন সব কথাকে প্যাঁচানোর চেষ্টা করা হয়, যেন নিজের প্রাণ বাঁচানো যায়, যেন নিজের স্বার্থ উদ্ধার হয়। 'কওলে সাদীদ' বা সহজ সরল কথা বলার মানদন্ড আল্লাহ্ তা'লার সর্বোত্তম আদেশগুলোর মাঝে একটি। বলা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার নিকট সর্বোত্তম এটাই যে, সত্যতা কোন প্যাঁচ ও জটিলতা ছাড়াই হবে। যদি এই আদেশটিই পালন করা হয়, তবে আমাদের পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে শুরু করে অন্যান্য সামাজিক কলহ, সবকিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমাদের না আদালতে যাওয়ার প্রয়োজন হবে আর না সালিস দরবারের। তাহলে সর্বত্র শান্তিময় পরিবেশ বিরাজমান থাকবে। ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝেও সত্যতার মানদন্ড উন্নততর হবে।

অত:পর সত্যের মানদন্ড অর্জনের নসীহতের সাথে এই তাগিদও করা হয়েছে, যেসব ঘরোয়া বৈঠকে বা সভায় সত্য কথা বলা হয় না, নোংরা এবং অনর্থক কথা-বার্তা চলতে থাকে, সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে যাও। যেখানে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, সেসব মজলিসে যেও না। আজকাল নোংরা ও অর্থহীন কথাবার্তা অনেক সময় অজান্তেই নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনায় এসে যায়। নেযামের বা ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা চলতে থাকে। আমি ইতোপূর্বেও একাধিকবার বলেছি, অধস্তন স্তরে সংশোধন না হলে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কথা যদি থাকে তা আমার নিকট পৌঁছান, কিন্তু বৈঠকে বসে যখন এসব কথা বলেন, তখন এগুলো অনর্থক কথা হয়। কেননা এতে সংশোধন হয় না বরং কলহ্-বিবাদ আরও বৃদ্ধি পায়।

এরপর **এই যুগে টিভিতে নোংরা ফিল্ম রয়েছে। ইন্টারনেটে অত্যধিক নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ ফিল্ম রয়েছে, নাচ-গান ইত্যাদি রয়েছে। এমন গান রয়েছে, যেখানে দেব-দেবীর নামে যাচনা করা হয়। কিছু ভারতীয় ছবিতে দেব-দেবীর মহিমা বর্ণনা করা হয়, যাতে এক এবং সবচেয়ে বড় ও সর্বশক্তিমান খোদার অস্বীকৃতি হয়ে থাকে। অথবা এমন প্রকাশ করা হয় যে, এসব দেব-দেবী ও মূর্তি খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর মাধ্যম। এসবই অনর্থক ও শির্ক। শির্ক এবং মিথ্যা একই জিনিস। এসব গানও শোনা উচিত নয়।**

এরপর **কম্পিউটারে ফেসবুক, টুইটার, চ্যাটিং প্রভৃতিও রয়েছে। এগুলোতে আড্ডা চলতে থাকে যখন এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের সাথে লড়তে থাকে, অনেক সময় খুবই নোংরা এবং বাজে কথা চলতে থাকে। কিছু তরুন আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, কী কী কথা চলতে থাকে। প্রথমে তো স্বেচ্ছায় নিজেরা এতে অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু পরে এমন সব কথা-বার্তা হতে থাকে, যেসব কথা কোন ভদ্র-ব্যক্তি শুনতে ও দেখতে পারে না। ভাল ভাল বংশের ছেলেমেয়েরা এসবে জড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের নোংরামী প্রকাশ করতে থাকে।**

সুতরাং একজন আহমদীর এসব থেকে আত্মরক্ষা করে চলা জরুরী। একজন আহমদী মুসলমানের জন্য তো আদেশ এটাই যে, সে সর্বোত্তম কথা'র খোঁজ করবে, সেই সর্বোত্তমের অনুসন্ধান কর, যা পুণ্যার্জনে অগ্রগামী করে, যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দায় পরিণত হও এবং সেই অভিশাপ থেকে বাঁচতে পারো, যা এসব লোকদের ওপর পড়বে। যাহোক, অনেক সর্বোত্তম কথা রয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শিখিয়েছেন। নেকীর রাস্তা অবলম্বন করা এবং অন্যদেরকে জানানো সর্বোত্তম এবং পাপ থেকে বিরত থাকা এবং বিরত রাখা 'সর্বোত্তম'।

আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিন ও প্রকৃত-

বর্তমান-সমাজে আমরা দেখছি, স্বাধীনতার নামে কত বেশী নির্লজ্জ আচরণ করা হয় আর তা করা হয় প্রকাশ্যে দিবালোকে। টেলিভিশনে, ইন্টারনেটে, খবরের কাগজে লজ্জাস্কর বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। ফ্যাশন শো এবং পোশাক শো-এর নামে উলঙ্গপনা শেখানো হয়। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এটি অপছন্দনীয়, পাপ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীত।

বান্দাকে এটাই বলেন যে, তোমাদের কথা 'সর্বোত্তম' হওয়া উচিত। এক জায়গায় তিনি বলেন, "আর প্রত্যেকেরই রয়েছে একটি লক্ষ্য, যার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। সতুরাং তোমরা পুণ্যকাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর।" (সূরা বাকারা : ১৪৯)

সুতরাং যখন নেকীতে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা থাকবে, তখন কথা ও কাজ দু'টোই 'আহ্‌সান' বা 'সর্বোত্তম' হবে। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে চান, সেভাবে হবে। যদি নেকীতে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা থাকে, নি:সন্দেহে শয়তান থেকে এবং শয়তানের হামলা থেকে বাঁচার চেষ্টাও থাকবে। খুতবার শুরুতে আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, এতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, (বনী ইসরাঈল: ৫৪) নিশ্চয় শয়তান তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে।" অর্থাৎ মানুষের মাঝে শয়তানের অনেক অর্থ রয়েছে।

অধিকাংশই আমরা জানি। শয়তান সে, যার প্রত্যেক কথা রহমান খোদার আদেশের বিরুদ্ধে অহংকার, বিদ্রোহ এবং ক্ষতি সাধন-ক্ষতিসাধনকারী এবং এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী হিংসার আগুনে দগ্ধ। মোটকথা, প্রত্যেক কথা, যেটি 'সর্বোত্তম' এবং যেটি করার আদেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, 'হুকুকুল্লাহ্' এবং হুকুকুল ইবাদ' যেন পলন করা হয়। শয়তান এর বিপরীত আদেশ দেয়। এই আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'নাযাআ' বা 'আননাযও' এর অর্থ শয়তানী কথা বা পরামর্শ, যার লক্ষ্য লোকজনকে একে-অপরের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া এবং বিভেদ সৃষ্টি করা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, শয়তান মানুষের 'আদুওয়ান মুবিনা' বা সুস্পষ্ট শত্রু। যদি তুমি আমার বান্দা হয়ে সর্বোত্তম যেসব কথা তা না বলো এবং সর্বোত্তম কাজ না কর আর সেগুলোর ওপর আমল না করো, তবে রহমান খোদার দাসত্ব থেকে বেরিয়ে শয়তানের কোলে গিয়ে পড়বে। এবং শয়তান তোমাদের মাঝে মিথ্যাও সৃষ্টি করবে, অহংকার এবং বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে এবং অন্যদের ক্ষতিসাধনের প্রতিও তোমাদেরকে আকৃষ্ট করবে। হৃদয়ে কুমন্ত্রণা দিবে এবং হিংসার আগুন জ্বালাবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, **তোমরা প্রতি রাতে শোবার সময় শেষ দুই সূরা-সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নিজের শরীরে ফুঁ দিবে, যেন শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও কুমন্ত্রণা এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পার এবং এদিকে তোমাদের মনোযোগ থাকে।** এটাও স্মরণ রাখবে, আমাদের এসব থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করতে হবে, যেন তিনি আমাদেরকে নিরাপদ রাখেন।

সুতরাং সর্বোত্তম কথা সে সময়ই হবে এবং নেকীতে অগ্রগামী হওয়া এবং শয়তানের কবল থেকে বেঁচে থাকার অবস্থা তখনই সৃষ্টি হবে যখন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য সাথে থাকবে। তাঁর কাছে দোয়ার মাধ্যমে হেদায়েত চাওয়ার সাথে সাথে তাঁর আদেশাবলীর অনুসন্ধান করা হবে এবং শয়তান থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এবং তার আমলসমূহকে ধ্বংস করার জন্য সর্বদা চেষ্টারত থাকে। এমনকি সে নেকীর কাজেও তাকে পথভ্রষ্ট করতে চায় এবং কোন না কোনভাবে গন্ডগোল সৃষ্টি করতে চায়। নামাযের মধ্যেও লোক দেখানো ইত্যাদি কোন উপায়ে ধোকা দিতে চায়। (অর্থাৎ নামাযীরা নামাযের মাঝে হৃদয়ে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত থাকে) একজন ইমামকেও এই বিপদে ফেলতে চায়।

সুতরাং এর আক্রমনের ভয় থেকে নি:শঙ্কচিত্ত হওয়া উচিৎ নয়। কারণ এর আক্রমণ ফাসেক (অবাধ্য) ফাজের (পাপাচারী) দের ওপর প্রকাশ্যেই হয়ে থাকে। এরা তাদের আক্রমণের শিকারও বটে। কিন্তু ধার্মিকদের ওপর আক্রমণ করতে তারা দ্বিধা করে না। কোন না কোন ভাবে আক্রমনের সুযোগ করে নেয়। যারা আল্লাহর ফজলের (অনুগ্রহের) আওতায় থাকে, শয়তানের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম আক্রমণ সম্পর্কে অবহিত থাকে, তারা এর থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া করতে থাকে। কিন্তু যারা অপরিপক্ক ও দূর্বল হয়ে থাকে, তারা কখনো কখনো আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রিয়াকারী (লোক দেখানো নেকী) এবং নিজেকে নেকমনে করা, এর থেকে নিরাপদ থাকতে মলমাতি নামের এক

ফেরকা আছে। যারা নিজেদের নেকীকে প্রকাশ করে না এবং নিজের মন্দ আচরনকে প্রকাশ করে। একটি ফেরকা এমনও আছে যারা বলে নেকীকে প্রকাশ করো না বরং নিজেদের মন্দ আচরণকে প্রকাশ কর, যেন কেউ একথা না বলে যে এরা বড়ই ধার্মিক। 'তারা মনে করে এভাবে আমরা শয়তানের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকব।' কিন্তু আমার মতে এরাও কামেল বা পূর্ণতা প্রাপ্ত নয় । এদের অন্তরেও অন্য কেউ আছে। তাদের অন্তরে অন্য কেউ যদি না থাকত, তাহলে তারা অমন করত না। আল্লাহর পথের পথিক একজন মানুষ মারেফতে (রূহানীজ্ঞানে) তখন পূর্ণতা লাভ করে, যখন কোন প্রকারে, কোন ভাবেই অন্যের রং তাদের অন্তরে বিরাজ না করে । এমন লোকেরা ফেরকাবন্দী হয়ে পরে থাকে না। তাঁরা এমন কামেলের (পূর্ণতা প্রাপ্ত) দল হয়ে থাকেন, যাদের হৃদয় সম্পূর্ণ ভাবে গায়ের বা অন্যদের প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকে।

যা হোক, এর থেকে কেউ যেন মনে না করে যে নবীগণ যারা মর্যাদা লাভ করেন তাদের কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হয় না। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'মায়ের পেট থেকে কেউ এটা লাভ করে আসে না।' বিভিন্ন সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের মান উন্নত করতে চেষ্টা করে যাও। বরং বলেছেন, ওলি হও, ওলির পুজারী হয়ো না।' আল্লাহ তা'লা তো আমাদের সামনে মহানবী (সা.) এর উদাহরণ রেখেছেন, উত্তম উদাহরণ (উস্‌ওয়ায়ে হাসানা), আখ্যা দিয়ে বলেছেন, এর ওপর চলতে চেষ্টা কর।

অতএব শয়তানের আক্রমন থেকে নিজেকে বাঁচাতে অনেক বেশী চেষ্টা করতে হবে। এজন্য-যেমন আল্লাহ বলেছেন, উত্তম কথার প্রয়োজন। প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা দোয়াও শিখিয়েছেন, কুরআন মজিদের শেষের দুটি সূরা শয়তানের আক্রমন থেকে রক্ষার দোয়া সম্বলিত। অন্যএ আল্লাহ বলেছেন, যদি শয়তানের পক্ষ থেকে বিপথগামী করার মত কথা শোন, শয়তান এমন কথা বলে যা উত্তম কথার বিপরীত, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। আল্লাহর আশ্রয়ে আসার জন্য অনেক বেশী দোয়া কর।

'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়। 'লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়। আল্লাহ্ তা'লা আশ্বাস দিচ্ছেন যদি কেউ শোনে বা জানে তা হলেন তিনি-ই, খাঁটি অন্ত:করনে যদি দোয়া করা হয়, তাহলে নিশ্চয় সে দোয়া তিনি কবুল করেন।

এখানে সুস্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে, শয়তানের হিংসার আগুন যে আগুনে, সে নিজেও জ্বলেছে এবং আদম (আ.) এর আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে এবং বেরিয়ে গেছে। তারপর মানুষকে ঐ আগুনে জ্বালানোর প্রতিজ্ঞাও করেছে, এটি বড় ভয়ংকর কথা। হিংসার ভয়ঙ্কর এই আগুন থেকে বাঁচতে অনেক বেশী চেষ্টা তদবির করতে হবে। বিশেষ করে এর থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ কাছে অনেক বেশী কেঁদে কেঁদে দোয়া করা আবশ্যক। শয়তানের আক্রমন দুই প্রকার– এক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বা করাতে সে আক্রমন করে থাকে। দুই অপর দিকে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটাতে সে চেষ্টা করে। অথচ উত্তম কথা আল্লাহর ভালবাসার দিকে নিয়ে যায়। আবার আল্লাহর খাতিরে মানুষ মানুষের সাথে ভালবাসা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আমি যেমন পুর্বে বলেছি, হুকুকুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার আদায়) এবং হকুকুল ইবাদ (মানুষের অধিকার প্রদান) 'উত্তম কথা' ছড়িয়ে দিয়ে আদায় হয়। এজন্যই আমাদের এই শ্লোগান, যা আমরা দিয়ে থাকি 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো পরে' এর দ্বারা অন্যরাও খুব প্রভাবান্বিত হন। তারা যদি আমাদের মজলিসে আসেন, তাহলে তারা এ কথার উল্লেখ না করে পারেন না।

এখন যদি আমরা নিজেদের ভেতরে এর প্রতিফলন না দেখি, তাহলে কেবল শ্লোগান তোলা অর্থহীন। আল্লাহতা'লার নির্দেশ আছে, আমরা বার বার জামা'তের সামনে রাখছি, 'রোহামাও বায়নাহুম' নিজেদের মাঝে তারা একে অপরের সাথে দয়া ও নম্রতার আচরণ করব, ভালবাসা ও মায়ামমতায় ব্যবহার করবে। এরাই এমন যে, সঠিক অর্থে তারা মু'মিন। এটি মু'মিনের বৈশিষ্ট বা চিহ্ন। আমরা যত বেশী উচ্চস্বরে বক্তৃতা করি, আমরা যত বেশী প্রমান করতে চেষ্টা করি না কেন, যতই এই শ্লোগান দিতে থাকি না কেন, 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃনা নয় কারো পরে', আমরা বার বার উত্থাপন করি যে, আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ এক জামা'ত, আমরা উদাহরণ সৃষ্টি করেছি; যতই আমরা চেষ্টা করি কিন্তু প্রকৃত অর্থে তখনই এর সু-প্রভাব সৃষ্টি হবে, যখন আমরা আমাদের গৃহে, আমাদের আশ-পাশে, এমন পারিবেশ সৃষ্টি করতে পারব, যেখানে সকলে একে অপরের সাথে মায়া-মমতার আচরন করব, একে অপরের ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখব। এটিও এমন একটি নেকী, যে সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বিশেষ ভাবে জোরালো উপদেশ দিয়েছেন:

"ওয়াল ইয়াফু ওয়াল ইয়াসফাহূ" ক্ষমা কর, ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ মোটকথা, খোদা তা'লার অগণিত এমন নির্দেশ আছে, যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য এনে দেয়। কিন্তু ইহ-সংসারের জীবনটি এমন, যেখানে পদে পদে শয়তানের সম্মুখীন হতে হয়, যাতে অনেক সময় আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়, আর ওসব কথা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে, যেগুলো করার নির্দেশ একজন মু'মিনকে, রহমান খোদার বান্দাকে আল্লাহ্ দিয়েছেন।

সুতরাং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, শয়তান তার কাজ চালিয়ে যাবে। সে তো আদম (আ.) এর সময় থেকে আল্লাহ্‌র কাছে সুযোগ চেয়ে নিয়েছে যে, আমাকে যার উদ্দেশ্যে সিজদা করতে বলেছ, তাকে আমি সোজা পথ থেকে বিপথগামী করব। অধিকাংশকেই আমি এমন ভাবে বিভ্রান্ত করব যে, তারা আমার অনুসরণ করবে। রহমান খোদার অনুগামী কমই হবে এবং শয়তানের অনুসারী হবে বেশী। আল্লাহ্ বলেছেন, 'যারা তোর অনুসরণ করবে, তাদেরকে আমি জাহান্নামে পাঠাব।

এ যুগে, যেমন আমি উদাহরণও দিয়েছি, অনেক এমন কথা আছে, যা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায়, সেগুলোর সঠিক ব্যবহার মন্দ নয়, কিন্তু অসদব্যবহার মন্দের সম্প্রসারণ ঘটায়, আবর্জনা ছড়ায়, পাপ-পঙ্কিলতা ছড়ানোর কারণ হয়। অথচ এ সবের সঠিক ব্যবহার পুণ্য ছড়াতে সাহায্য করে। টি.ভি. আছে, জ্ঞান ছড়ায়, তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু এরই সাহায্যে নির্লজ্জতা ছড়াচ্ছে। এযুগে টিভির সবচেয়ে উত্তম-ব্যবহার আহমদীরাই করছে বা আহমদীয়া জামা'ত করছে। আমি জলসার দিনগুলোতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, অনেকের মাঝে এর প্রভাব পড়েছে। তারা আমাকে জানিয়েছে যে, আমরা পূর্বে এমটিএ দেখতাম না। আপনার বলার পরে

এখন আমরা দেখতে শুরু করেছি। আমাদের দুঃখ হচ্ছে, আমরা পূর্বে কেন দেখি নি, কেন আমরা এর সাথে যুক্ত হইনি। কেউ কেউ লিখেছেন, এক সপ্তাহ বা দশ দিনেই আমাদের মাঝে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন এবং জ্ঞানের উন্মেষ ঘটেছে, জামা'ত সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অতএব, আমি পুণরায় স্মরণ করাচ্ছি, এদিকে দৃষ্টি দিবেন; নিজেদের গৃহে এই পুরস্কারের সুফল লাভ হওয়া উচিৎ, যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তা'লীম তরবিয়তের, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দিয়েছেন, যেন আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে, নিজেদেরকে এমটিএ এর সাথে সংযুক্ত হতে হবে। এখন তো জুমুআর খুতবা ছাড়াও আরও অনেক লাইভ প্রোগ্রাম সম্প্রচার হচ্ছে, যার দ্বারা জ্ঞানগর্ভ, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হতে পারে। জ্ঞান বৃদ্ধিও হয়। এখাতে জামা'ত লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে বছরে।

অতএব, জামা'ত যদি সদস্যদের তা'লীম তরবিয়তের জন্য এর থেকে উপকার গ্রহণ না করে, তাহলে তারা নিজেদেরকে বঞ্চিত রাখবে। এখন জামা'তের বাইরের মানুষও উপকৃত হচ্ছেন। জামা'তের সত্যতা তারা বুঝতে পারছেন। আল্লাহ্‌র তৌহীদ, ইসলামের সত্যতা তারা উপলব্ধি করছেন, সঠিক জ্ঞান লাভ করছেন। অতএব, এদেশে বসবাসকারী আহমদীদের এবং অন্যান্য দেশের আহমদীদেরও উচিৎ এমটিএ-কে পুরোপুরি ব্যবহার করে লাভবান হওয়া। এম,টি,এ-এর অপর একটি কল্যাণ এই যে, এর দ্বারা খেলাফতের কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বড় সুযোগ রয়েছে। অতএব, এর থেকে সবাই উপকৃত হওয়া উচিৎ। □

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বিবেক দিয়েছেন, যা ব্যবহার করে সে নিজের সুখ-সুবিধার উপকরণ সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ্ বলেছেন। "ইন্না যাআলনা মা আলাল আরযি জিনাতাল্লাহা লিনাবলুওয়া হুম আইয়্যুহুম আহ্‌সানু আমালা" (সূরা আল কাহাফ : ৮) অর্থাৎ আমরা পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছি, সবগুলোকে সুন্দর বানিয়েছি, যেন তাদের পরীক্ষা করা হয় যে, কে উত্তম কর্ম করে।

সুতরাং এখানে পৃথিবীর সবকিছুকে সৌন্দর্যের উপকরণ বলার মাধ্যমে এর গুরুত্ব বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি আবিস্কার যা আমরা করেছি, সবকিছুকে সৌন্দর্য বলা হয়েছে, এসবের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বলা হয়েছে, প্রত্যেকের গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন এবং এর উপকার তখনই পাওয়া যাবে, যখন এর সাথে উত্তম-কর্ম সংযুক্ত হবে। অতএব, আমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা আবিস্কৃত জিনিসকে কাজে লাগাও, উপকৃত হও। তবে উত্তম কর্ম যেন উদ্দেশ্য হয়। এগুলো আবিস্কার, এসব তখনই সুন্দর, যখন এসবকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেভাবে কাজে লাগানো হয়। ফেৎনা-ফাসাদ যেন সৃষ্টি না হয়। যদি উত্তম কর্মের সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এগুলো বিপদের কারণ হবে। যেমন আমি উদাহরণ দিয়েছি। এই টেলিভিশনই দেখুন! এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যাচ্ছে আবার বিপদও সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক পরিবার ইন্টারনেট এবং চ্যাটিং-এর কারণে ধ্বংস হচ্ছে। সন্তানরা নষ্ট হচ্ছে। কারণ স্বাধীনতার নামে আল্লাহ্‌র দান করা জিনিসের অসৎ ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ খাঁটি বান্দাদের জন্য আল্লাহ্‌র আদেশ ছিল, উত্তম বাক্যের সাথে উত্তম কর্মকে সামনে রাখতে হবে। আর কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া চাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। যাহোক, কুরআন শরীফে অগণিত নির্দেশ রয়েছে, সবগুলো এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

একটা কথার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ সম্পর্কে গোড়াতেও কিছু বলেছি। আল্লাহ্ তা'লা একস্থানে বলেছেন, সব সময় উত্তমকথা সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্ এটি খুব পছন্দ করেছেন :

"ওয়ামান আহসানু কাওলাম মিম্মান দাআ ইলাল্লাহি ওয়া আমেলা সালেহান ওয়া ক্বালা ইন্নানি মিনাল মুসলিমীন" (হা-মীম সাজদা : ৩৪) অর্থ, "এবং এর চেয়ে বেশী উত্তম কথা আর কী হতে পারে–যে, মানুষকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা হয় এবং সে নিজ ঈমান অনুসারে কর্ম করে এবং বলে, আমি তো আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত"। অতএব, এই সুন্দরতম শিক্ষা এবং কথা একজন আল্লাহ্‌র বান্দার কাছে আশা করা হয়েছে এবং এমনই আশা করা উচিৎ। যে আয়াত পূর্বে পাঠ করেছি, "সে বলে যা অতি উত্তম।" এমন কথা বলা যা হবে উত্তম কথা এবং সবচেয়ে ভাল কথা যা বলতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু পরের আয়াতে বলা হয়েছে, সবচেয়ে ভাল কথা এসে জমা হয়েছে এই একটি কথার মাঝে–এ আয়াতে এর সারাংশ এসেছে যে, সবচেয়ে উত্তম কথা, 'আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান কর।'

তারপর যে অন্যকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকবে, তাকে বিবেচনা করতে হবে, তার নিজের অবস্থান কি, সে নিজে কতটা ওসব কথার ওপর আমল করে, যে কথার দিকে সে ডাকছে। আমি আরম্ভেও বলেছিলাম, আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমরা এমন কথা বল না, যা তোমরা কর না। কারণ এটি পাপ।'

সুতরাং আমি যেমন বিস্তারিত ভাবে বলেছি, যারা আল্লাহ্ তা'লার দিকে মানুষকে আহ্বান করবে, তাদের কথা ও কাজ এক হতে হবে এবং নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনে রাখতে হবে। এটি ইসলামের সেই সর্বোচ্চ, উত্তম- শিক্ষার নমুনা যে, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান কর– আর এর চেয়ে বেশী বড় কথা এবং উত্তম কথা আর হয় না। এবং এটি আল্লাহ্‌র অনেক বেশী পছন্দ। কিন্তু যে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকবে, সে নিজের আমলকে 'আমলে সালেহ' (সবচেয়ে ভাল) বানাবেন। 'আমলে সালেহ' সেই আমল, যা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত হয়। নেকী সম্প্রসারণের কারণ হয়, সময়োপযোগী এবং সংস্কারের কারণ হয়। এখানে আমলে সালেহ এর একটি উদাহরণ দেব, যার সরাসরি এর সাথে সম্পর্ক নাই, কিন্তু আপনাদের সামনে স্পষ্ট করতে এর প্রয়োজন।

ইতিপূর্বে আমি বলে এসেছি যে, ক্ষমা করা, ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা একটি পুন্যকর্ম। আল্লাহ্ বলেছেন, ক্ষমা প্রদর্শনের অভ্যাস কর। কিন্তু একজন পাকা চোরকে ক্ষমা করা এবং খুন করতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা অবশ্যই উত্তম কাজ নয়, আর আমলে সালেহও নয়। এখানে আমলে সালেহ হবে সমাজকে বাঁচাবার জন্য এবং মন্দকর্ম প্রতিরোধ করতে এমন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া, যে বার বার অন্যায় করতে থাকে এবং জেনে বুঝে করে। এমন আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। মোটকথা, বলেছেন, দাওয়াত ইলাল্লাহ্-এর চেয়ে উত্তম আর কোন কাজ হয় না।

এটি এমন কাজ, যা আল্লাহ্ খুব পছন্দ করেন। তবে দাওয়াত ইলাল্লাহ্ যিনি করেন, তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে শুধু দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করাই যথেষ্ঠ নয়। বরং তার প্রত্যেকটি কর্মকে আমলে সালেহ বানাতে

হবে। এটি হতে পারে না যে, একদিকে সে বলবে যে আমি দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করি, আল্লাহ্‌র খাস বান্দা আমি, দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করা আমার কাজ। কিন্তু অপর দিকে সে স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি তার যে দায়িত্ব, তা পালন করছে না। অথবা একজন গৃহিনী নিজ ঘর-সংসারের দেখাশোনা, সন্তানদের তরবিয়তের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন না। অথবা অন্যান্য ইসলামী নির্দেশনা সমূহ পালন করছেন না। যেমন মহিলাদের পোশাক-, যেখানে লজ্জা-শরমের এবং পবিত্রতার নির্দেশ রয়েছে– সে দিকে নজর দিচ্ছেন না। অথচ দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌তে মনযোগ আছে। এমন ব্যক্তির তবলীগে যখন কোন ব্যক্তি আহমদী হবে এবং কুরআন পড়বে, তখন সে বলবে, তুমি তাকে ইসলামের তবলীগ করেছ–কিন্তু কুরআনে তো লজ্জা নিবারন ও পর্দার নির্দেশ আছে, তুমি তো এর ওপর আমল কর না? অনুরূপভাবে আরো অনেক মন্দ বিষয় রয়েছে; মিথ্যা, পরনিন্দা, অনুরূপ আরো অনেক কথা ও কাজ। অতএব, এতটুকু কথাতে তার ক্ষমা হবে না যে, আমি দাওয়াত ইলাল্লাহ্ করি। আল্লাহ্ বলেছেন; উত্তম কথা যিনি বলেন, তাকে তো আমলে সালেহ্‌ও করতে হবে। বলতে হবে, 'আমি আনুগত্য করেছি'; পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছি; সকল নির্দেশের প্রতি "আমি শুনেছি ও মান্য করেছি" বলে শ্লোগান দিতে পারি এবং এটিই একজন প্রকৃত মুসলমানের চিহ্ন।

সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমি অষ্ট্রেলিয়া জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনারা স্মরণ রাখুন, দাওয়াত ইলাল্লাহ্ খোদার খুবই পছন্দের কাজ। তবে এজন্য এর সাথে নিজের কর্মকে আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী সাজানো প্রয়োজন এবং পরিপূর্ণ আনুগত্যের নমুনা দেখানো প্রয়োজন। এটি এমন একটি দেশ, যার জনসংখ্যা প্রায় ২৩ মিলিয়ন (দু'কোটি ত্রিশ লাখ)। কিন্তু আয়তনে অনেক বড়। বরং এটি একটি মহাদেশ। অথচ জনসংখ্যা খুব বেশী না, কয়েকটি শহর মাত্র। যদিও শহরগুলোর দূরত্ব অনেক বেশী।

আমি জলসায় বলেছিলাম, লাজনা, খোদ্দাম, আনসার এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে (নেযাম) তবলিগের প্রতি অনেক বেশী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আমাদের কাজ পয়গাম পৌঁছে দেয়া– ফলাফল আল্লাহ্‌র হাতে। আমরা যদি কাজের সাথে সাথে দোয়াও করে যাই, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ ফলাফলও ভাল আসবে। কেউ যেন না বলে, 'আমরা আহমদীয়া জামা'তের কথা জানি না।' ঘটনাক্রমে ঈদের দিন এমটিএ-এর এক প্রোগ্রাম এখানকার স্টুডিওতে গিয়ে দেখলাম। আমাদের নায়েব আমীর খালেদ সাইফুল্লাহ্ সাহেব বললেন, ১৯৮৯ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ঈদের নামায ও জুমুআর নামায পড়িয়েছিলেন– তখন উপস্থিতি ২৫০ জনের বেশী ছিল না। এবারের উপস্থিতি প্রায় ২৫০০ (আড়াই হাজার)। তাৎক্ষণিক আমার মন্তব্য ছিল, আলহামদুলিল্লাহ্!

অবশ্যই আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে যে, সংখ্যা বেড়েছে। তারপর আমি যখন চিন্তা করলাম, তখন চিন্তিত হলাম যে, প্রায় চব্বিশ বছরে এই সংখ্যা। আর এর মধ্যে পাকিস্তান এবং ফিজি থেকে আসা আহমদীদের সংখ্যাই বেশী। তবলীগের ফলে সম্ভবত: দু'চার জনই হবে। তাদেরকে সামলানোও হয়নি। চব্বিশ বছরে চব্বিশজন আহমদীও হয়নি। স্থানীয়ভাবে বছরে একজনও হয়নি। এখানে যে সংখ্যা বেড়েছে তা তো পাকিস্তানে ও ফিজিতে আহমদীদের সংখ্যা কমে হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার জামাতের চেষ্টায় হয়নি। সুতরাং বাস্তবতাকে না দেখলে তো হবে না–বরং সব সময় সামনে রাখা দরকার। এটি চিন্তার বিষয়। কমপক্ষে আমার জন্য চিন্তার কারণ। অনুরূপভাবে, স্থানীয় জনসংখ্যা ছাড়াও যারা আগে থেকে এসে এখানে বসবাস করছে, অষ্ট্রেলিয়ান বলে পরিচিত, আর স্থানীয় আদিবাসী যারা আছে, তাছাড়া আরব বা অন্যান্য জাতির লোকেরাও এখানে এসে বসবাস করছে, এদের মধ্যে তবলীগ হওয়া উচিৎ। যথারীতি পরিকল্পনা করে তবলীগের কাজ আরম্ভ করা উচিৎ। আমি দেখেছি, অষ্ট্রেলিয়ার মানুষ শোনার সাহস রাখে, তারা তখন বলতেও চায়, আর ইচ্ছা আছে তাদের যদি যোগাযোগ স্থাপন করে, সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের কাছে যাওয়া যায়, তাহলে কিছু না কিছু, যারা সৎ প্রকৃতির মানুষ আছেন যাদের পাওয়া যাবে এবং তারা ধর্মকে গ্রহণ করতে পারেন সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে ইসলামের শান্তি বাণী, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম পৌঁছানো আমাদের কর্তব্য।

মেলবোর্নে কিছু মানুষ, আমার সাথে যাদের দেখা করানো হয়েছে, তাদের অধিকাংশ এমন, যারা আহমদীদেরকে চেনে। কিন্তু তারা প্রকৃত-ইসলামের বার্তা পায় নি। তারা আহমদীদের সংগঠন হিসেবে চিনে, ভাল চরিত্রের মানুষ বলে জানে, যাদের সাথে বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু ইসলামের আসল পয়গাম পায় নি। এদিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। জলসার সময় একজন নিবেদিত প্রাণ আহমদীকে পুরস্কার দেয়া হলো এজন্য যে, সে অসমর্থ হওয়া সত্বেও ইসলামের শান্তির বাণী সম্বলিত বিশ হাজার ফ্লাইয়ার (প্রচারপত্র) বিতরণ করেছে। আপনারা বলেছেন, সারা দেশে প্রায় চার হাজার আহমদী; আমার মনে হয় সংখ্যা এর চেয়ে বেশী হবে। যদি সংখ্যা পাঁচ হাজারও হয়, আর এর অর্ধেক দুই হাজার আহমদীও ফ্লাইয়ার বিতরণ করত, তাহলে দশ মিলিয়ন বিতরণ হতো। ধরে নেয়া যেত, প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা পর্যন্ত সঠিক পয়গাম পৌঁছে যেত। তারপর তবলীগের জন্য নতুন প্যাম্পফ্লেট তৈয়ার করা যেতে পারে। আর এর অর্ধেক বা চতুর্থাংশও যদি বিতরণ করা হতো, তাহলে মিডিয়ার নজরে পড়ত। তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো। তারপর সংবাদ মাধ্যমগুলো এটিকে তুলে নিত। অন্য কয়েকটি দেশে এমন হয়েছে। আমেরিকার মত দেশেও এমন হয়েছে। পরবর্তী কাজ তাদের দ্বারাই হতো।

মিডিয়ার সাথে সম্পর্ক এবং এর প্রতি দৃষ্টিও আছে এবং আমি দেখলাম, ভাল সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রকৃত- ইসলামের পয়গাম প্রচারেও ব্যবহার হওয়া উচিৎ। এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে বয়স্ক লোকেরাও এসেছেন, তাদেরও আমি বলেছি, একথাই বলব যে, তাদের হাতে সময় আছে, তাদের কর্মব্যস্ত্যতাও নাই। ঘরে অবসর জীবনযাপন করছেন, তারা নিজেদের সময় কুবরানী করুন এবং লিফলেট প্রভৃতি বিতরণ করুন। জামাতের যে সমস্ত পুস্তকাদী রয়েছে, তা সাথে করে নিয়ে যান এবং এগুলো বিতরনের মাধ্যমে তবলীগ করুন। আমি যে সংখ্যা বা পরিসংখ্যান বর্ণনা করেছি, তা তাদের মাঝে কেবল চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যেই করেছি। আমি জানি, অষ্ট্রেলিয়াতে প্রকাশনা বাবদ এখন যে খরচাদি হয়ে থাকে, তা শুধুমাত্র অষ্ট্রেলিয়া জামা'তের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। পাঁচ দশ পয়সায় অথবা সেন্ট খরচ করেও যদি একটি লিফলেট ছাপানো হয়, তবে সেক্ষেত্রে দশ মিলিয়ন লিফলেট ছাপাতে

কমপক্ষে পাঁচ লাখ ডলার প্রয়োজন।

যাইহোক, লক্ষাধিক পরিমাণও যদি ছাপানো হয়, তবে এক্ষেত্রে অনেক কাজ হবে। আর প্রেসের সাথে যদি ভাল সম্পর্ক থাকে, তবে বাকী কাজটাও হয়ে যায়। আমি শুনেছি, আপনারা এখানে রক্তদান কর্মসূচী পালন করে থাকেন কিন্তু এটিকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে করুন, যাতে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা জগতবাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে লোকেরা এইদিকে আরও বেশী দৃষ্টি দিবে এবং কাজের অনেক ক্ষেত্র উন্মুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ্। আমি আগেই বলেছি এই কাজের জন্যে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুযায়ী তোমরা সৎ কর্ম কর, সৎ কাজে অগ্রগামী হও এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ-বিশ্বাস স্থাপন কর। দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ কর। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর সেসমস্ত বান্দার অন্তর্ভুক্ত করুন। যারা সৎ কর্মও করে থাকে এবং পুণ্য ও আনুগত্যকারী হিসেবেও এগিয়ে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর ফলে পুণ্য-প্রতিদানে ভূষিত করুন। আল্লাহ্ এখানকার স্থানীয় লোকদের চেয়েও আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

(জুমুআর) নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব। জানাযাটি হলো মোহতরমা সাহেবযাদী আমাতুল মতিন সাহেবার, যিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কন্যা এবং মোকাররম সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি গত ১৪ অক্টোবর রাত প্রায় বারোটার সময় রাবওয়াতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ঈদের দিন তাকে সমাহিত করা হয়। তিনি ১৯৩৬ সালে ২১ ডিসেম্বর কাদিয়ানে দারুল মসীহতে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আম্মাজান এবং খলীফাতুল মসীহ্ সানী তার জন্য সে সময়ে অনেক দোয়া করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর স্ত্রী অর্থাৎ হযরত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবার একমাত্র কন্যা ছিলেন। তিনি হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) এর দৌহিত্রি ছিলেন। আর হযরত ডা. মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর মামা হন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তার এই কন্যার জন্য কিছু নযমও লিখেছিলেন, যা কালামে মাহমুদের মধ্যে 'আতফালুল আহমদীয়ার তারানা' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এর একটি পংক্তি হলো–

মেরী রাত দিন বাস এহী এক সাদা হেঁয়

কেহ ইস আলম মেঁ কওন কা ইক খোদা হেঁয়

সর্বোপরি আমি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর সন্তানদের মধ্যে বিশেষ করে কন্যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখেছি যে, তারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক রাখতেন এবং নিয়মিত নামায পড়তেন। অধিক সময় ধরে তারা নামায আদায় করতেন। যেহেতু মোকাররম মীর মাহমুদ আহমদ নাসের সাহেব একজন মোবাল্লেগ ও ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন, স্পেনে মোবাল্লেগ হিসেবে কাজ করেন, আমেরিকাতেও কাজ করেন। ফলে তিনি তার সাথে থাকার সুযোগ পান আর একজন মোবাল্লেগের স্ত্রী হিসেবে তার যে দায়িত্ব ছিল, তিনি পূর্ণভাবে তা আদায় করেন। স্পেনে মসজিদে বাশারত যখন নির্মাণ হল, তখন তারা দু'জনই সেখানে ছিলেন। এই মসজিদের নির্মাণ কাজে এবং রান্নাবান্নার কাজেও তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করেন। তেমনি কোন সুযোগসুবিধা ছিল না। এ কথা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও বর্ণনা করেন যে, এমনও সময় গেছে, তিনি রাত তিনটার সময় কাজ শেষ করে ঘুমাতে গেছেন। আর তখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে অত্যন্ত খুশি মনে এটি প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আজকে একটু ঘুমানোর সুযোগ দিয়েছেন। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি কাজ করেন। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মসজিদে বাশারতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাও সফলতা লাভ করেছিল।

মেহমানদের এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর খাবারও নিজে রান্না করতেন। যেহেতু সে সময়ে লঙ্গরখানার সুব্যবস্থা ছিল না। এজন্য সকল কাজ তিনি নিজ দায়িত্বেই করতেন। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়াতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন। সে সময় জামা'তের অবস্থা এমন ছিল যে, সামান্য একটি ওয়াশিং মেশিনেরও ব্যবস্থা ছিল না। তিনি নিজেই কাপড় কাচতেন এবং ঘরের সমস্ত কাজ-কর্ম নিজ হাতে করতেন। কেউ সাহায্য করতে আসলে তিনি তাদের নিষেধ করতেন। সর্বদা নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস ছিল। পাকিস্তান লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র কেন্দ্রীয় সংগঠনের তিনি বিভিন্ন সেক্রেটারী পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখতেন, বরং পূর্বের চেয়ে তা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

যখন তিনি প্রথমবার লন্ডন জলসায় আসেন, তো কোন একজন ব্যক্তিকে তিনি বলছিলেন, আমিতো খলীফার সাথে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারব না। গত বছর জলসাতেও তিনি এসেছিলেন, তখন অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, সেবারও আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তার চার পুত্র সন্তান এবং একজন কন্যা সন্তান রয়েছে। আগেই বলেছি, তার স্বামী মোকাররম মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব নাসের। তার দুই পুত্র ওয়াকফে যিন্দেগী। একজন হলেন ড. গোলাম মোহাম্মদ ফররুখ সাহেব, যিনি আমেরিকা থেকে কম্পিউটার সাইন্সের ওপর পিএইচডি করেছেন এবং বর্তমানে রাবওয়াতে সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার দপ্তরে কর্মরত আছেন। অপরজন আমেরিকাতে ছিলেন। পরবর্তীতে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে লন্ডন চলে আসেন এবং সেখানে আমার সাথে কাজ করছেন। তার নাম মুহাম্মদ আহমদ সাহেব। তিনি এখানেও (অষ্ট্রেলিয়াতে) এসেছিলেন। মায়ের মৃত্যুর খবর শুনে কিছুদিন পূর্বে রাবওয়াতে চলে যান। এই দুজন ভাই অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে জামাতের সেবা করে যাচ্ছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ভবিষ্যতেও সেবা প্রদানের তৌফিক দান করুন, আর মরহুমার মর্যাদাও উন্নীত করুন। তার একমাত্র মেয়ে হল্যান্ডে থাকে। আরেক জন ছেলে পেশায় ডাক্তার। তিনি দুবাইয়ে থাকেন। অপর আরেক জন আমেরিকাতে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে জামা'তের সাথে এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখার তৌফিক দান করুন। মোকররম মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবও বর্তমানে একাকীত্ব বোধ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও নিজ অনুগ্রহে শান্তি বর্ষণ করুন। আর যেটুকু কমতি থেকে যায়, তা কেবল আল্লাহ্ তা'লাই পুরণ করতে পারেন। দীর্ঘদিন তারা দু'জন একসাথে কাটিয়েছেন এর ফলে কিছুটা অনুভব তো থেকেই যায়। আল্লাহ্ তা'লা এই মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর আমি আগেই বলেছি, নামাযের পরে আমি তার জানাযার নামায পড়াব।

অনুবাদঃ জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

বিশ্বশান্তি ঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ *"আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করবার এবং আত্মীয়-স্বজনকে (দান করবার মত অন্য লোকদেরকেও) দার করার আদেশ দিচ্ছেন এবং (সর্বপ্রকার) অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (আন্ নাহ্ল-১৬ঃ৯১)*

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ ۝

অর্থাৎ *"তোমরা জেনে রাখ, এই পার্থিব-জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র। এর দৃষ্টান্ত বারিধারার ন্যায়, যার (দ্বারা উৎপাদিত) শাক-সজী কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা পরিপক্ক হয় এবং তুমি তা হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, যা অবশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, এবং পরকালে রয়েছে (দুনিয়াদার লোকদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীল লোকদের জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা এবং সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন (সাময়িক) ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতিরেকে কিছুই নয়।" (আল হাদীদ-৫৭ঃ২১)*

সমসাময়িক সমাজে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা কি হতে পারে,– এই প্রশ্নটির দিকে আমরা এখন দৃষ্টি ফেরাবো।

সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থা

দুর্ভাগ্যক্রমে সমাজে এখন নৈতিক আচরণের ওপর থেকে ধর্মীয় প্রভাব দ্রুত অপসৃত হয়ে পড়ছে। পরিস্থিতিটার আরও অবনতি ঘটছে এই কারণে যে, ধর্মীয় দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভের জন্য এখন একটা তীব্র আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং তা সমকালীন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া সমাজে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তার অভাব এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা থেকে একটা আতংকেরও সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ধর্মীয় ও নৈতিক বিধি-নিষেধের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রবণতার পাশাপাশি সমান্তরালভাবেই বিরাজ করছে। চিরঞ্জীব এক খোদার প্রতি যে বিশ্বাস- যে খোদা মানুষের শুধু ভাগ্যই নির্ধারিত করে দেন নি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্যাটার্ন-পদ্ধতি নির্ধারণেরও অধিকার যাঁর আছে- সেই খোদার প্রতি বিশ্বাস অতি দ্রুত ধ্বসে পড়ছে।

পবিত্র কুরআনে এই অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে যা বলেছে, তা হচ্ছে ঃ

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ

অর্থাৎ *'স্থলে ও জলে ফাসাদ ছেয়ে গেছে।' (রূম- ৩০ঃ৪২)*

খৃষ্টধর্ম পাশ্চাত্যের সর্বপ্রধান ধর্ম বিধায়, বর্তমান শতাব্দীর সূচনা অব্দি এর অনুসারীদের নৈতিক আচরণের ওপরে এর একটা শক্তিশালী ও কার্যকর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, হায়! সেটা আর এখন নেই।

তার পরিবর্তে অন্য এক সভ্যতা গড়ে ওঠছে। এবং তা গড়ে ওঠেছে। এবং তা গড়ে ওঠছে বৈজ্ঞানিক সাম্রাজ্যবাদ, দ্রুততর বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং বস্তুবাদী প্রগতি, প্রভৃতির সংমিশ্রণে। এই

সভ্যতা খৃষ্টধর্মকে ধাপে ধাপে পাশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করছে। ফলে, এই ধর্মকে সামাজিক আচরণ ডৌল (গঠন) করার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে অধোগামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

সুতরাং, আজকের পাশ্চাত্যের নৈতিক অবস্থার যে চরিত্র, তাও কম বেশী খৃষ্টান; ঠিক তেমনিভাবে প্রায় সব মুসলিম দেশেরও নৈতিক আচরণ ইসলামিক। এবং এটাই হচ্ছে, দুর্ভাগ্যক্রমে, পৃথিবীর অন্য সব দেশেরও সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা।

দুনিয়াতে আজ প্রচুর বৌদ্ধ আছে, কনফুসিয়ান আছে, হিন্দুও আছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বৌদ্ধধর্ম-কনফুসিয়ান বা হিন্দুধর্ম বড় একটা নজরে পড়ে না।

'জল আর জল সর্বত্র যে দিকেই চাই

কিন্তু পানীয় যে জল, তা এক বিন্দুও নাই।'

যদি কোন সমাজে নীতি শাস্ত্র সম্পর্কিত ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত বিধি-নিষেধ না থাকে, তাহলে, সেখানে ভাবী প্রজন্মের কাছে নৈতিকতা, সক দিক থেকেই, তার বাঁধন হারিয়ে ফেলবে, এবং সেই প্রজন্ম আর অন্ধভাবে সেই গতানুগতিক ঐতিহ্যকে বিশুদ্ধ ও বৈধ বলে গ্রহণ করবে না। এই শ্রেণীর প্রজন্ম তখন এক প্রকার শূন্যতার মধ্যে পতিত হয়ে একটা জটিল ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে বাধ্য হবে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনুসন্ধানের জন্য একটি নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হবে, এবং এই অনুসন্ধান-প্রক্রিয়াতে হয়তোবা উন্নত এবং অধিকতর সন্তোষজনক একটা আচরণবিধি আবিষ্কার করা যেতে পারে, না-ও পারে। তবে, অপরপক্ষে, এর দরুন একটা সম্পূর্ণরূপে বিশৃংল অবস্থা কিংবা একটা নৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, এই পরবর্তী পরিস্থিতিটাই আধুনিক সমাজের কাম্য।

আজ দুনিয়া জোড়া পরিবর্তনের একটা প্রবল হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে, তা সে হাওয়া প্রচ্যের হোক আর প্রতীচ্যের হোক, ধর্মীয় হোক আর সেক্যুলার হোক। কিন্তু, এটি একটা অশুভ হাওয়া, এবং তা সমগ্র জগতের জলবায়ুকে দুষিত করে ফেলছে।

আমাদের সামাজিক আবহাওয়ার দূষণের মাত্রা যে দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে দিকে, আধুনিক-বিশ্ব যতটা সতর্ক ও সচেতন, তার চাইতে সে, মনে হয়, বেশী সতর্ক ও সচেতন বস্তুগত বা ভৌতিক আবহাওয়ার দূষণ বৃদ্ধির ব্যাপারে। পবিত্র কুরআন স্পষ্টতঃই এমন একটা যুগের কথা বলতে গিয়ে গোষণা করেছে ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

অর্থাৎ *'কসম সেই কালের। নিশ্চয় ইনসান (সামগ্রিকভাবে) বড় ক্ষতির মধ্যে আছে! তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে, এবং তারা একে অপরকে সত্যের ওপরে দৃঢ় থাকবার এবং তা প্রচার করবার তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে দুঃখ-কষ্টে ও আপদে বিপদে) একে অপরকে ধৈর্যেরও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে। (আল আসর– ১০৩ঃ ২-৪)*

শোষণ, মুনাফেকী, ভন্ডামি, স্বার্থপরতা, নির্যাতন, লালসা, ভোগের উন্মত্ত প্রয়াস, বিশৃংখলা, দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, মানবাধিকার লংঘন, প্রতারণা, ধোকাবাজি, দায়িত্বহীনতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার অভাব, ইত্যাদি হচ্ছে আধুনিক সমাজগুলোর বৈশিষ্ট্যের রূপ। এই যে কুৎসিৎ চেহারা, যা দিনে দিনে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, তাকে আর সভ্যতার পাতলা আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। অবশ্য, এটা বলা ঠিক হবে না যে, মানুষের অধ:পতনের এই জাতীয় ভয়াবহ অবস্থা অতীতে আর কখনোই দেখা যায় নি। বস্তুতঃ. অতীতের অনেক সভ্যতাই অনুরূপ সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল এবং অবশেষে মানবেতিহাসে তাদের অধ্যায়ের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে, নৈতিক অধঃপতনের শিকারে পরিণত হয়েছিল বলে পৃথিবীর বিশেষ কোন অঞ্চলকে এককভাবে চিহ্নিত করা হলে তা ভুল হবে।

সমাজ সমানে ভেঙ্গে পড়ছে সর্বত্রই। সর্বাত্মক (Totalitarian) দর্শনের দ্বারা শাসিত দেশগুলোর বিরুদ্ধে তথাকথিত মুক্ত-বিশ্বের ব্যক্তি-স্বাধীনতা চেতনার যে উত্থান ঘটছে, যা স্বয়ং একটা ভারসাম্যহীন প্রবণতা হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা-ই প্রধানতঃ ক্রমবর্ধমান সামাজিক অসদাচরণের জন্য দায়ী।

সর্বাত্মক দর্শন দ্বারা শাসিত দেশগুলোর ব্যক্তি-স্বাধীনতার চেতনার যে ক্রমাগত উত্থান ঘটছে, তা বর্তমানে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আদায়ের জন্য একটা ভয়ানক যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে। এবং সেনাবাহিনীর কোন শক্তিশালী উগ্র বামদলের পক্ষ থেকে যদি কোন অভ্যুত্থান না ঘটে, তাহলে, বৃহত্তর স্বাধীনতার এই প্রবণতার আশু বিজয় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর, যা ঘটবে তা সাবেক কমুনিষ্ট দেশগুলোর মুক্তিপ্রাপ্ত যুবকদের নৈতিক প্রত্যাশার ক্ষেত্রে মোটেই শুভ হবে না।

দু'দুটো প্রজন্মের প্রায় সবাই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছিল একটা নিরীশ্বরবাদী সমাজের শূন্যতার মধ্যে। তাদেরকে নৈতিক আচরণের পথে পরিচালনার এবং সে সম্পর্কে শৃংখলা শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে তেরী নৈতিক-মূল্যবোধের নীতিমালার অভাব তো আছেই, তদুপরি, বৃথা, আমোদ-প্রমোদপূর্ণ সুখের অন্বেষা এবং দায়িত্বহীনতার প্রবণতা, প্রভৃতির বিপদও পাশ্চাত্য থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে এবং তা রাশিয়া এবং পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলোর যুবকদের ওপরে আছড়ে পড়ছে। এবং তা আগামী বছরগুলোতে এই সব যুবকের নৈতিক আচরণের ওপরে একটা ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।

একই সঙ্গে, যে কেউ লক্ষ্য করতে পারবে যে, বহু যুগ ধরে ধর্মহীন জীবনযাপনের যে অভিজ্ঞতা, তা সমসাময়িক সমাজের জন্য শুধু যে অমঙ্গলই রেখে গেছে তা নয়, বরং তা পরিষ্কারভাবে কিছু কিছু সহায়ক সুযোগও সৃষ্টি করে গেছে। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুধু সমাজবাদী দুনিয়ার সংগে ধর্মেরই বন্ধন ছিন্ন করেনি, বরং সেই সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও মতাদর্শ, যেগুলো আপনা আপনি আগে থেকেই দূষিত ও বিকৃত হয়ে পড়েছিল, সেগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছিল। খৃষ্টধর্মই হোক বা ইসলামই হোক, খৃষ্টানরাই হোক বা মুসলমানরাই হোক এবং তারা যে কোন সম্প্রদায় বা ফের্কারই হোক, তাদের নিজ নিজ ধর্মের ধারণার মধ্যে একটা মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, যা বিশ্বাসের বহু ক্ষেত্রেই ধর্মীয় মতাদর্শ ও প্রাকৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে বিসদৃশ। দুটোই তো একই সঙ্গে সঠিক হতে পারে না। তাই ধর্মীয় মতাদর্শ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখাবার জন্য এটা বিশেষ প্রশিক্ষণের

প্রয়োজন আছে, যা থাকলে আর বিচলিত হওয়ার কিছু থাকে না। পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্যে বাস করা, সম্ভবতঃ সহজ নয়। তবে পরস্পর বিরোধী অবস্থাগুলো যদি জনগণের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জন্ম নেয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। ক্রমান্বয়ে এক সময় এই অবস্থাটার সৃষ্টি হয়েছিল, যখন ধর্মীয়-সম্প্রদায়গুলো পরস্পরবিরোধী অবস্থাগুলোর মধ্যে, সেগুলোকে উপেক্ষা করেই, কোনমতে বাস করতো। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তাদের জনগণের জন্য যে জিনিষটা করেছিল, তা হচ্ছে, অন্য সব আদর্শ বা ধ্যান-ধারণা থেকে তাদের মগজ ধোলাই করে ফেলা এবং এদিকে সেদিকে শোনা এবং দেখা বা দ্বৈতদৃষ্টি থেকে তাদেরকে নিরাময় করে তোলা।

এটা, প্রতিদানে, তাদেরকে এক প্রকার নিরীহত্ব দান করেছিল, যা অর্জন করা তখনই সম্ভব যখন আর কোন ভন্ডামিই অবশিষ্ট থাকে না। এটা বলার সময় এখনও আসেনি যে, আগামীতে সংগ্রামের কঠিন সময় যখন আসবে তখন এই নিরীহত্ব তাদের নৈতিক উপকারে আসবে কি না। তবে, একটা ব্যাপার একেবারেই নিশ্চিত যে, আজকের দুনিয়ার অন্য যে কোন জাতির লোকদের চাইতে তারা সত্যের বাণী শুনতে এবং তা গ্রহণ করতে অনেক বেশী নমনীয় হবে।

কিন্তু হায়! এই কথাটি আজকের দুনিয়ার তথাকথিত 'মুক্ত' জাতিগুলোর মধ্যে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে খাটে না। এদের যে কেউ ব্যক্তি-স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে স্বাধীনতার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বস্তুতঃ, যা খুশী তাই করতে পারে। এই প্রবণতাটার নেতা হিসেবে আমেরিকা ব্যাকপকভাবে এবং কার্যকরভাবে প্রথম বিশ্বের ইয়োরোপীয় দেশগুলোর ওপরেই শুধু প্রভাব বিস্তার করছে না, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বের জাতিগুলোর ওপরেও প্রভাব বিস্তার করছে। মানুষকে নৈতিক-জীবনের নিয়ম-শৃংখলা থেকে মুক্ত করে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সেই বিকৃত ধারণার প্রতিধ্বনি এখন শোনা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যবনিকার ওপার থেকেও।

দেহপশারিণী, সমকামী, মাদকাসক্ত, পতিতা, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর অপরাধীরা সংখ্যায় ও শক্তিতে বেড়ে চলেছে। তাদের উপদেশদাতাকে 'নয় কেন?' শুধু এতটুকু বলেই তারা তাদের আচরণ বা ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। এবং তাদের এই ধৃষ্টতা এখন এতটা বেড়ে গেছে যে, তা সমকালীন সমাজের জন্য রীতিমত চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক শান্তি

রাজনৈতিক শান্তির বিষয়টিকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই খুব সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ইস্যু হচ্ছে, জনগণের জন্য কোন্ রাজনৈতিক পদ্ধতিটি ভাল হবে বা মন্দ, তা নির্ণয় করা। আবার আমাদেরকে এটাও খুঁজে বের করতে হবে যে, জনগণের দুঃখ-দুর্দশা এবং অসন্তোষের জন্য কে দায়ী রাজনৈতিক পদ্ধতি ও তার অন্তর্নিহিত ত্রুটিবিচ্যুতি, না কি অন্য কিছু? দোষটা কি পদ্ধতির, না কি যারা চালায় তাদের? অনৈতিকভাবে, স্বার্থপর, লোভী অথবা দূর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব, যা গণতান্ত্রিক উপায়েই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তা কি সমাজের জন্য সত্যিসত্যিই ভাল ও কল্যাণকর? না কি তার পরিবর্তে, অন্য কোন পদ্ধতির সরকার, যেমন, সদাশয় একনায়কত্ব?

আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং তার নিশ্চয়তাদানের ব্যাপারে, সমকালীন রাজনীতিবিদদেরকে দেওয়ার মত কিছু উপদেশ আছে ইসলামের।

মানবজীবনে সকল ক্ষেত্রেই নিরংকুশ-নৈতিকতা অনুসরণ করে চলার জন্য ইসলাম অসাধারণ জোর দেয়, রাজনীতিও এর কোন ব্যতিক্রম নয়।

কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিই সরাসরি বাতিলযোগ্য নয়

আমরা এখানে এই মন্তব্য দিয়ে শুরু করতে পারি যে, ইসলামে বিশেষ কোন একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিকে, অন্য সব পদ্ধতি বাদ দিয়ে,বৈধ বলে উল্লেখ করা হয় নি।

সন্দেহ নেই যে, পবিত্র কুরআন এমন একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথাই বলেছে, যেখানে শাসকগণ জনগণের দ্বাই নির্বাচিত হবে, কিন্তু এইটাই একমাত্র পদ্ধতি নয় যা ইসলাম অনুমোদন করে। কোন সার্বজনীন ধর্মের তরফে এটা কোন মৌলিক বিশেষ অধিকার হতে পারে না যে, তা মাত্র একটি রাজনৈতিক পদ্ধতিকেই বাছাই করে নিয়ে সেটাকেই শুধু স্বীকৃতি দিবে। এবং এই সত্যকে উপেক্ষা করবে যে, পৃথিবীর সকল এলাকা এবং সমাজের জন্য একটি মাত্র রাজনৈতিক পদ্ধতি কখনই কার্যতঃ প্রযোজ্য হতে পারে না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতেও গণতন্ত্রের বিকাশ এখনও অতটা ঘটেনি, যতটা বিকাশ ঘটলে গণতন্ত্র তার কাংখিত রাজনৈতিক আদর্শের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। পুঁজিবাদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, এবং পুঁজিবাদী দেশগুলোতে অত্যন্ত শক্তিধর রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলার ফলে কোথাও সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়াই সম্ভব হচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান সমস্যাদি, যুক্ত হচ্ছে "মাফিয়া" চক্রের অস্তিত্বের প্রসার ও অন্যান্য প্রেশার-গ্রুপ। যে কেউ সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, গণতন্ত্র, এমনকি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশী গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও নিরাপদ নয়। এমতাবস্থায়, তৃতীয় বিশ্বের জন্য গণতন্ত্র কী করে উপযোগী হতে পারে?

সুতরাং, যদি বলা হয় যে, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো অথবা পৃথিবীর তথাকথিত ইসলামী দেশগুলোর জন্যে প্রয়োগ হতে পারে, তবে তা হবে, একটা ফাঁকা ও অবাস্তব দাবীরই সমতুল্য।

আমি যা বলতে চাই তা হচ্ছে, ইসলাম বিশ্বের কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিকেই প্রত্যাখ্যান করে না। ইসলাম এটা জনগণের পসন্দ-না পসন্দের ওপরেই ছেড়ে দেয়, এবং কোন দেশের ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের ওপরেও ছেড়ে দেয়। ইসলাম যার ওপর জোর দেয়, তা সরকার পদ্ধতি নয়, তা বরং, সরকার কীভাবে তার দায়িত্ব পালন করবে, তার ওপরই। জনগণকে আমানত জেনে দায়িত্ব পালনে যদি ইসলামী আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোন শাসন-পদ্ধতি পরিচালিত হয়, তবে ইসলাম যে কোন পদ্ধতিকে-তা সে সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র যা-ই হোক না কেন- তাকে আপন পরিসরে ঠাঁই করে দিতে সক্ষম।

পারস্পরিক আলোচনার অগ্রাধিকার

পবিত্র কুরআনে গণতন্ত্রের মর্মকথা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে; এবং রাজতন্ত্রকে অধর্মীয় বা অনৈশ্বরিক বলে

আল্ কুরআনের সংজ্ঞা অনুসারে, একজন ভোটার তার ভোটের নিরংকুশ মালিক নয়, বরং আমানতদার। একজন আমানতদার হিসেবে, তাকে অবশ্যই তার আমানত ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং সৎভাবে সম্পাদন করতে হবে, যাতে করে এই আমানত তার বিবেচনামতে যথার্থ প্রাপকের কাছেই অর্পিত হয়। তাকে অবশ্যই সচেতন ও সাবধান থাকতে হবে যে, তাকে তার কাজের জন্য খোদা তা'লার দৃষ্টিতে দায়ী হতে হবে।

নাকচ করে না দিয়েও, মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য সব সরকার পদ্ধতির চাইতে সুনিশ্চিতরূপে গণতন্ত্রই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

আদর্শ মুসলিম সমাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ
وَٱلْفَوَٰحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا۟ هُمْ يَغْفِرُونَ ۝ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟
لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝
وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْىُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ۝

অর্থাৎ *"এবং তোমাদেরকে যা কিছু দান করা হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ-সামগ্রী মাত্র, এবং আল্লাহ্‌র নিকট যা কিছু আছে, তা উৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক স্থায়ী- তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে এবং নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে; এবং যারা বড়পাপ ও অশ্লীল কার্যকে বর্জন করে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন ক্ষমা করে দেয়, এবং যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, এবং নামায কায়েম করে; এবং তাদের কাজ কর্ম তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাদেরকে যা রিয্‌ক দান করেছি তা থেকে খরচ করে। এবং তাদের ওপরে যখন কোন যুলুম হয়, তখন তারা অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করে।" (সূরা আশ্ শূরা-২৪ঃ ৩৭-৪০)*

'আমরোহুম শূরা বাইনাহুম' (তাদের কাজ-কর্ম তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়) বাক্যাংশটি মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং এতে পরিষ্কারভাবে এই ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, সরকারের কাজ-কর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে হবে পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে; এবং একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, সরকার হচ্ছে জনগণের সরকার- যা কিনা গণতন্ত্রের সংজ্ঞার প্রথম অংশ।

ফলে, জনগণের সাধারণ ইচ্ছাই (common will) হয়ে উঠে শাসনের ইচ্ছা (ruling will) পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমেই। গণতন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে 'জনগণের দ্বারা' এই অংশের কথাও পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে একআয়াতের মধ্যে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا

অর্থাৎ *'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে ন্যস্ত কর তাদের ওপরে যারা সেগুলির দায়িত্ব সম্পাদনে সর্বাধিক যোগ্য।" (সূরা আন্ নিসা-৪ঃ৫৯)*

এর অর্থ এই যে, তুমি যখন তোমার শাসকবর্গ মনোনীত করার জন্য তোমার ইচ্ছা প্রকাশ করবে, তখন তুমি সেই আমানত তার ওপরেই অর্পণ করবে, যে তার ন্যায্য-প্রাপক। শাসকবর্গ নির্বাচনে জনগণের অধিকারের কথা তো নিশ্চয়ই বলা হয়েছে, তবে তা প্রসঙ্গক্রমে। আসল জোর দেওয়া হয়েছে, কী করে সেই অধিকার প্রয়োগ করা হবে তার ওপরেই। মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটা শুধু তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রশ্নই নয় যে, তারা তাদের অধিকারকে যেমন খুশী প্রয়োগ করবে, এটা বরং তার চেয়েও অনেক বড় প্রশ্ন, এটা জাতীয় আমানতের প্রশ্ন। আমানতের ব্যাপারে তো আপনার এটা-ওটা নানানটা পসন্দের সুযোগ নেই। আপনাকে সম্পূর্ণ সততা, বিশ্বস্ততা এবং নিঃস্বর্থপরতার সঙ্গে আপনার আমানতের দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। আমানত অবশ্যই সেখানেই অর্পিত হতে হবে, যেখানে তা সত্যিকার অধিকার বলেই অর্পিত হওয়া উচিত।

অনেক মুসলিম পন্ডিত বা আলেম এই আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়ে শুধু এতটুকুই বলতে চান যে, ইসলামও গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও পদ্ধতির কথা বলেছে, ঠিক যেমন তা বলা হয়েছে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দর্শনে। কিন্তু, কথাটা আংশিক সত্য।

পবিত্র কুরআনে পরামর্শের যে পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সমসাময়িক পাশ্চত্য-গণতন্ত্রের ন্যায় দলীয় রাজনীতির যেমন কোন স্থান নেই, তেমনি তার মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংসদগুলোতে বা প্রতিনিধি পরিষদে যে ষ্টাইলে এবং যে স্পিরিটে রাজনৈতিক বিতর্কাদি অনুষ্ঠিত হয়, তারও স্থান নেই। বিষয়টির এই দিকটা নিয়ে যেহেতু আমরা পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি সেহেতু এখানে আর বেশী কিছু বলার দরকার নেই ।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞার দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে এটাও লক্ষ্য করা দরকার যে, পারস্পরিক পরামর্শের এই ধারণা অনুযায়ী ভোট দানের অধিকার প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ভোটারদের এখতিয়ারভুক্ত, এবং এক্ষেত্রে এমন কোন বিধি বা শর্ত আরোপ করা চলবে না, যাতে সেই অধিকার ক্ষুন্ন হতে পারে। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম অনুসারে, কোন ভোটার তার ভোট একজন ক্রীড়ণকের পক্ষেও দিতে পারে, কিংবা তার ভোট সে নষ্ট করতেও পারে অথবা তার ব্যালট পেপারটি সে ব্যালট-বাক্সের পরিবর্তে ডাষ্টবিনেও ফেলতে পারে। এজন্য সে নিন্দাভাজনও হবে না; গণতন্ত্রের নীতি খেলাপ করার জন্য তার প্রতি দোষারোপ করা হবে না।

আল্ কুরআনের সংজ্ঞা অনুসারে, একজন ভোটার তার ভোটের নিরংকুশ মালিক নয়, বরং আমানতদার। একজন আমানতদার হিসেবে, তাকে অবশ্যই তার আমানত ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং সৎভাবে সম্পাদন করতে হবে, যাতে করে এই আমানত তার বিবেচনামতে যথার্থ প্রাপকের কাছেই অর্পিত হয়। তাকে অবশ্যই সচেতন ও সাবধান থাকতে হবে যে, তাকে তার কাজের জন্য খোদা তা'লার দৃষ্টিতে দায়ী হতে হবে।

এই ইসলামী কন্‌সেপ্ট বা ধারনা মতে, যদি কোন রাজনৈতিক দল কোন প্রার্থী মনোনীত করে, আর যদি কোন দলীয় সদস্য মনে করে যে সেই প্রার্থী তার জাতীয় আমানতের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে, তাহলে সেই সদস্যের উচিত হবে, সেই আমানত সম্পাদনে অযোগ্য প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে দলত্যাগ করা। পার্টি-আনুগত্য কোন সদস্যের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উপরে হস্তক্ষেপ করতে পরবে না।

তাছাড়া আমানত সম্পদিত হতে হবে সরল বিশ্বাসে। সুতরাং প্রত্যেক ভোটারকে নির্বাচনের সময় ভোটাধিকার প্রয়োগে পূর্ণরূপে অংশ গ্রহণ করতে হবে, যদি না সে কোন কারণে অপারগ হয়। অন্যথায়, সে তার আমানতের দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হবে। ভোট দানে বিরত থাকা বা ভোটাধিকার প্রয়োগ পরিহার করে চলার যে ধারণা যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচক মন্ডলীর প্রায় অর্ধে মাত্র ভোটার ভোট দানের গরজ করে থাকে, তার কোন জায়গা নেই ইসলামী কন্‌সেপ্টের গণতন্ত্রে।

ইসলামী সরকারের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি

হাল যামানার মুসলিম রানৈতিক চিন্তাবিদদের মধ্যে এই ধারণাটা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে, ইসলাম গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। আবার এদেরই রাজনৈতিক দর্শন অনুসারে, খোদা হচ্ছেন চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ, সার্বভৌমত্ব শুধু তাঁরই এখতিয়ারভুক্ত।

ঐশী কর্তৃত্ব

নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র মালিকানা বা বাদশাহাত সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে ঃ

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝

অর্থাৎ "অতএব, আল্লাহ্ মহিমান্বিত প্রকৃত-সর্বাধিপতি (বাদশাহ্)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই, তিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।" (আল্ মু'মেনুন-২৩ঃ১১৭)

এই যে মৌলিক নীতি অর্থাৎ, শাসন করবার সমস্ত অধিকার কেবল আল্লাহ্‌র, এবং তিনিই সার্বভৌমত্বের একমাত্র প্রভু, তা নানাভাবে উল্লেখিত হয়েছে কুরআন করীমে, উপর্যুক্ত আয়াত তারই অন্যতম উদাহরণ।

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রকাশিত হয় দু'ভাবে ঃ

ক) আইন (শরীয়াহ্ বা ব্যবস্থা), যার সর্বপ্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন করীম, হযরত রাসূলে পাক (সা.) এর সুন্নাহ্ এবং সেই সঙ্গে তাঁর সহীহ্ হাদীসসমূহ, যেগুলির বর্ণনা দিয়ে গেছেন প্রথম যামানার মুসলমানরা। এ সবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আইন প্রণয়নের যাবতীয় প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশনা। এবং বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছার মধ্যে হস্তক্ষেপ করবার কোনও অধিকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোন সরকারেরও নেই।

খ) উল্লিখিত নীতির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের কোন প্রক্রিয়াই বৈধ বলে গ্রাহ্য হবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে, ইসলামের বিভিন্ন ফের্কার আলেমদের মধ্যে আইন-কানুন বা শরীয়াহ্ সম্পর্কে কোন ঐকমত্য নেই। তবে একটা ব্যাপারে সব আলেমরাই একমত যে, আইন প্রণয়ণের খাস-এখাতিয়ার (Prerogative) একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশিত করেছেন ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা রাসূলে করীম (সা.)-এর ওপরে কুরআনী ওহীর (ঐশীবাণীর) মাধ্যমে।

মুসলিম সরকারগুলো কীভাবে কার্য পরিচালনা করবে, সে ব্যাপারে জনপ্রিয় ধারণা হচ্ছে, দৈনন্দিন প্রশাসনিক ব্যাপারে, কাজকর্মে, ব্যবস্থাদি গ্রহণে সরকার হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রকাশের বা রূপায়ণের যন্ত্রতুল্য মাধ্যম এবং ক্ষমতা অর্পিত হওয়ার মাধ্যমে জণগণই হয়ে ওঠে সার্বভৌমত্বের অধিকারী, আর এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

মোল্লাতন্ত্র

এটাই হচ্ছে তথাকথিত গোঁড়াপন্থীদের কট্টর মত। এরা মুসলিম জণগণের আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রবণতার সঙ্গে সমঝোতায় আসে শুধু এই শর্তে যে, মোল্লাদেরকে এই চূড়ান্ত অধিকার দিতে হবে যে, তারা সমস্ত গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বৈধতা যাচাই করবে 'শরীয়া'র ভিত্তিতে।

এটা যদি গৃহীত হয়, তাহলে এই দাবীটির অর্থ হবে এই যে, আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব খোদার হাতে থাকবে না, তা তুলে দেওয়া হবে গোঁড়াপন্থীদের হাতে, কিংবা বিশেষ কোন ফের্কার মোল্লাদের হাতে। যখন আপনি তাদের হাতে তুলে দেওয়া এই ভয়ংকার ক্ষমতাকে বিচার করে দেখবেন এই প্রেক্ষাপটে যে, কোনটি শরীয়া, এবং কোনটি শরীয়া নয়, তা নিয়েই স্বয়ং মুসলিম আলেমদের মধ্যে মৌলিক মত-পার্থক্য রয়েছে, তখন যে পরিণতি আপনার সামনে ভেসে ওঠবে, তা এক কথায় ভয়াবহ। গোঁড়াপন্থীদের মধ্যে আইন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধারার গোষ্ঠী (School of thought) রয়েছে অসংখ্য। এমন কি, একই গোষ্ঠীর মধ্যেও ফতওয়া দানের ব্যাপারে সব সময়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাছাড়া, ইতিহাসে দেখা যায় যে, খোদার প্রকৃত ইচ্ছা কি যা প্রকাশ পেয়েছে ইসলামী শরয়িতে, তা নিয়েও তাদের অবস্থান থেকে থেকেই পরিবর্তিত হয়েছে।

এই চিত্রটি সমকালীন ইসলামী বিশ্বের

সামনে একটা জটিল সমস্যা উপস্থাপিত করেছে, যে বিশ্ব মনে হয়, আজ অব্দি তার প্রকৃত পরিচয় খুঁজে ফিরছে। এটা এখন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সামনে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠছে যে, ঐ সকল মোল্লা বা আলেমদের ঐকমত্যে পৌঁছবার জায়গা মাত্র একটাই, এবং তা হচ্ছে, তাদের 'শরীয়াহ্' প্রবর্তনের আপোষহীন দাবী। সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর মোল্লাদের জিহ্বায় আরও বেশী করে পানি এসেছে ইরানী বিপ্লবের পর। তাদের কথা হচ্ছে, খোমেনী যদি পারে, তাহলে আমরা পারবো না কেন? এর পরে পরেই অবস্থিত তাদের আজগুবী কল্পনার রাজ্য, তাদের স্বপ্নের দেশ।

সাধারণ মানুষেরা তো বিভ্রান্ত। আপনার রাজনৈতিক মেনিফেষ্টো রচনা করতে এবং তা কার্যকর করতে আপনি কি আল্লাহ্‌র বানী এবং রাসূলে পাক (সা.)-এর বাণীকে অগ্রাধিকার দেবেন, না কি নিরীশ্বর ও তাক্‌ওয়াশূন্য সমাজের কোন মানুষকে অগ্রাধিকার দেবেন? প্রশ্নটি সাধারণ মানুষের জন্যে অত্যন্ত কঠিন। কারণ, তিন নিজেই তো এ ব্যাপারে হতভম্ব হয়ে আছেন এবং একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়ে আছেন।

বহু মুসলিম দেশের জনগণ ইসলামকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে ঃ তারা খোদার ইচ্ছার (Will of God) জন্য এবং ইসলামের পবিত্র পয়গম্বর (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদার জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। তথাপি, গোটা দৃশ্যটির মধ্যে এমন একটা কিছু রয়ে গেছে, যার জন্য তারা বিভ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ এবং দারুণভাবে অস্থির। যে অবস্থাটা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর প্রতি তাদের ভালবাসা সত্ত্বেও, অতীতের সরকারগুলোর আমলে বহু রক্তাক্ত ঘটনার স্মৃতিকে জাগরূক করে দেয়। যে ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়েছিল, হয় মোল্লাদের দ্বারা প্রভাবিন্বত হওয়ার কারণে, নয় তো মোল্লাদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করার কারণে। মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থাটা হচ্ছে, তারা পরস্পর বিভক্ত এবং দ্বিধান্বিত। অনেকে আছেন, যাঁরা মোল্লাদেরকে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে পারেন না, বরং তাদের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। তাঁরা অবশ্য মনে মনে এই আশাই পোষণ করেন যে, নির্বাচনের সময়ে মোল্লারা নয়,তাঁরাই নির্বাচিত হবেন, এবং তাঁরাই হবেন শরীয়ারও নির্বাচিত শক্তিশালী চ্যাম্পিয়ান। তাঁদেরকেই জনসাধারণ শরীয়া'র অভিভাবক হিসেবে মোল্লাদের চাইতে অধিক পসন্দ করবে। তাঁদের হাতেই জীবন সহজতর হবে, বাস্তবমুখী হবে; যা সম্ভব হবে না 'বেহেশতের হেফাযতকারীদের' কঠোর ও আপোষহীন নিয়ন্ত্রণের অধীনে। কিন্তু এটা যে একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলা, তা ঠিকই অনুধাবন করেন সত্যিকারের সৎ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদরা। আফসোস যে, তাঁরা দ্রুত সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছেন। রাজনীতি ও প্রতারণার সঙ্গে সত্য ও সাধুতা, এবং অন্য কোন মহৎ গুণ, মনে হয়, হাতে হাত দিয়ে চলতে পারে না। বুদ্ধিজীবিরা মোটামুটিভাবে গণতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত। তাঁরা ইসলামকে ভালবাসেন, কিন্তু তাঁরা ধর্মতান্ত্রিক শাসনকেও ভয় পান। তাঁরা গণতন্ত্রকে ইসলামের বিকল্প হিসেবে মনে করেন না বটে, কিন্তু তাঁরা সত্যিসত্যি এটাও বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে গণতন্ত্রকেই পেশ করেছে স্বয়ং পবিত্র কুরআন ঃ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

অর্থাৎ "এবং যারা নিজেদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয় এবং নামায কায়েম করে, এবং তাদের কাজ তাদের পরস্পরের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়, এবং আমরা তাদেরকে যা রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।" (সূরা আশ্ শূরা-৪২ঃ৩৯)

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝

অর্থাৎ "এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর; অত:পর যখন তুমি সংকল্প কর, তখন আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান-৩ঃ১৬০)

বিভিন্ন দলের মধ্যে এইরূপ দড়ি টানাটানির মোটফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পাকিস্তানের মত তরুণ মুসলিম দেশগুলো একটা নিরর্থক বিভ্রান্তি ও পরস্পর-বিরোধী অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে। এ সব দেশের নির্বাচক-মন্ডলীগুলো মেজাজগতভাবেই এর বিরোধী যে, আইন পরিষদগুলোতে মোল্লারা কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আসুক। এমনকি, শারীয়হ্-জ্বর বা উত্তেজনা যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখনও মোল্লারা নির্বাচনে শতকরা পাঁচ থেকে দশ ভাগের বেশী আসনে জয়লাভ করতে পারে নি। তবু, রাজনৈতিক নেতারা মোল্লাদের একটা অতিরিক্ত সমর্থনের বদলায় আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, এবং এর মাধ্যমে তারা একটা সম্পূর্ণ ঈর্ষামুক্ত অবস্থানে চলে যেতে চায়। যদিও মনের গভীরে তারা এই নিশ্চিত বিশ্বাসই রাখে যে, 'শরীয়াহ্' প্রবর্তনের ব্যাপারটা বস্তুতঃ কোন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের আইন প্রণয়নের নীতি-বিরুদ্ধ।

যদি আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব খোদার হাতেই থাকে, যা কিনা কোন মুসলমানই অঙ্গিকার করতে পারবে না, তাহলে এর যৌক্তিক পরিণাম এটাই দাঁড়ায় যে, মোল্লারা বা আলেমরাই কেবল 'শরীয়া' আইন বুঝবার এবং তার সংজ্ঞা দেবার খাস-এখতিয়ার রাখে। এই দৃশ্যপটে, আইন পরিষদগুলোর নির্বাচিত করার সকল কর্মকান্ডই ব্যর্থ ও অনর্থক প্রতিপন্ন হয়। আর যাই হোক, সংসদ সদস্যদের কাজতো শুধু এতটুকুই নয় যে, তারা কেবল মোল্লাদের দেখিয়ে দেওয়া জায়গাগুলোতেই দস্তখত করবে।

এটা সত্যিই দুঃখবহ যে, না রাজনীতিবিদরা, না বুদ্ধিজীবীরা কখনও আন্তরিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন যে, পবিত্র কুরআন কোন্ ধরনের সরকার-পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলোর কথা বলে বা স্বীকৃতি দেয়।

রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রতি বিভক্ত আনুগত্য

আল্লাহ্ তা'লার কথা এবং কাজের মধ্যে কোনও পরস্পরবিরোধিতা নেই। রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রতি কারো আনুগত্যের মধ্যে কোন সংঘাত নেই ইসলামে। কিন্তু, এই প্রশ্নটা কেবল ইসলামের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়।

মানবেতিহাসে এমন বহু ঘটনা ঘটে গেছে, যখন বহু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকেই এই প্রশ্নটার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

রোমান সাম্রাজ্য, বিশেষ করে, খৃষ্টান আমলের প্রথম তিন শতাব্দীতে খৃষ্টধর্মের প্রতি এই দোষারোপ করতো যে, তা আনুগত্যকে সাম্রাজ্য ও খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত করে

ফেলেছে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উত্থাপিত এই অভিযোগের পরিণতি এই হতো যে, আনুগত্যহীনতার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হতো এবং তাদের ওপরে বর্বর ও অমানুষিক নির্যাতন চলানো হতো, তাদেরকে ঘরবাড়ী ছেড়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হতো।

চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যেকার এই সার্বক্ষণিক সংঘাত-সংঘর্ষ ইউরোপীয় ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নেপোলিয়ান বোনাপোর্টের কথা বলা যায়, দিনি রোমান ক্যাথলিক মতবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন যে, তা আনুগত্যকে বিভক্ত করে ফেছে। তাঁর জোর দাবী এটাই ছিল যে, প্রথম আনুগত্য থাকতে হবে ফরাসী জনগণ ও ফরাসী সরকারের প্রতি, এবং ফ্রান্সে কোন ভ্যাটিক্যান পোপকে রোমান ক্যথলিকদের কোন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন করবার অনুমতি দেয়া হবে না; এবং রোমান ক্যাথলিকদের ধর্মমতকেও রাষ্ট্রের কোন কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না।

সমকালীন ইতিহাসে, আমার নিজের সম্প্রদায় আহমদী মুসলমানরা পাকিস্তানে অনুরূপ কারণে মারাত্মক সমস্যাদির মোকাবেলা করছে। পাকিস্তানের দীর্ঘতম সময়ের শাসক সামরিক ডিরেক্টর জেনারেল জিয়াউল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগপন্থী মোল্লা-মৌলবীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আহমদীরা বিভক্ত আনুগত্যের সেই সেকেলে অভিযোগের অতি সহজ শিকারে পরিণত হয়ে থাকে ক্রমাগত বর্ধিত হারে। এমনকি, পাকিস্তান সরকার জেনারেল জিয়ার অধীনে, এক ধরনের একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে আহমদীদের বিরুদ্ধে। এবং তাতে এই দাবী রটনা করে যে, আহমদীরা না ইসলামের প্রতি অনুগত, না পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি। (পাকিস্তান সরকারের সেই 'কালো' শ্বেত-পত্রের বিস্তারিত ও অকাট্য জবাব দিয়েছেন এই ভাষণদাতা স্বয়ং ঃ অনুবাদক)

এটা সেই উন্মুক্ত প্রেতাত্মা, যা আসর ফেলেছে বা পেয়ে বসেছে নতুন করে। মদ একই আছে, তবে বোতল বদলে ফেলা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি, কুখ্যাত সালমান রুশদীর ঘটনার সময়ে,বৃটেনে এবং ইউরোপের বহু স্থানে মুসলমানরা সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল যে, তারা বিভক্ত আনুগত্য পোষণকারী। যদিও এটার তীব্রতা তুঙ্গে পৌছেনি, তবু, আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিসাধন করবার যে ক্ষমতা, তাকে খাটো করে দেখবার অবকাশ নেই।

আইন প্রণয়নের অধিকার কি ধর্মের একচেটিয়া?

এটা একটা সার্বজনীন বিষয়। বিষয়টা নিয়ে অদ্যাবধি তেমন কোন পরীক্ষা নিরীক্ষাই চালানো হয় নি। রাজনীতিবিদরা বা ধর্মীয় নেতারা, কেউই, ধর্ম এবং রাষ্ট্রের মধ্যেকার এই সূক্ষ্ম নীল বিভক্তিকরণ রেখাটিকে মুছে ফেলবার উদ্যোগ নেয়নি।

খৃষ্টানদের সম্বন্ধে যতটা বলা যায় তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে এই ইস্যুটার সমাধান চিরদিনের জন্য হওয়া উচিত ছিল। কেননা, এ ব্যাপারে ফরীশিদেরকে প্রদত্ত ঈসা (আ.)-এর সেই ঐতিহাসিক জবাবই যথেষ্ট ছিল ঃ

'অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেনঃ সুতরাং কায়সারের জিনিষ কায়সারকে দিয়ে দাও, কিন্তু খোদার জিনিষ খোদাকে।' (মথি-২২ঃ২১)

এই কথা ক'টি গভীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ। যতটুকু প্রয়োজন তার সবটুকুই এতে বলা হয়েছে।

ধর্ম ও রাষ্ট্র হচ্ছে, সমাজ নামক ওয়াগনটির অনেকগুলো চাকার মধ্যে দু'টি চাকা। এই ওয়াগনের চাকার সংখ্যা দু'টি, চারটি, না আটটি, সেটা বড় কথা নয়; চাকাগুলো ঠিকটাক আছে কিনা, সেগুলো তাদের কক্ষে ঠিক মত ঘুরছে কিনা, সেটাই বড় কথা। এগুলোর একটার সঙ্গে আর একটা ধাক্কা লাগার প্রশ্নই ওঠে না।

পূর্ববর্তী সমস্ত ঐশী শিক্ষার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখে পবিত্র কুরআন এই বিষয়বস্তুকে বিস্তারিতভাবে পেশ করেছে, এবং সমাজের প্রত্যেকটি অংশের কাজকর্মের পরিধিকে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে চিহ্নিত করে দিয়েছে। বিষয়টিকে অতদ্যন্ত লঘু করে দেখানো হবে যদি কেউ ধারণা করেন যে, এমন তো কোন মিলন বিন্দু বা কমন (সাধারণ) জায়গা নেই, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র একে অপরের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারে। ধর্ম ও রাষ্ট্র-নীতিবিদ্যা অবশ্যই ওভারল্যাপ করে বা উপরোউপরি হয়, কিন্তু তা হয় পরস্পর সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে, একচেটিয়া করণের কোন উদ্দেশ্যই কারো থাকে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রতিটি ধর্মের নৈতিক শিক্ষার একটা বৃহৎ অংশ পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রণীত আইন-কানুনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে গৃহীত হয়। এই অংশটি কোন কোন রাষ্ট্রে ক্ষুদ্র হতে পারে, আবার কোন কোন রাষ্ট্রে তা তুলনামূলকভাবে আইনের একটা বৃহৎ অংশও হতে পারে। নির্ধারিত শাস্তিসমূহ লঘু অথবা গুরু হতে পারে; কিন্তু শাস্তিদান করা হয়, এমন বহু অপরাধের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অননুমোদনকে, ধর্মের বরাত ছাড়াই সবসময়ে গোচরীভুত করা যায়। এগুলোর সঙ্গে অনেক সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) আইনের সঙ্গতি যদি নাও থাকে তবু, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী জনসাধারণ এ সব ব্যাপারে কদাচিৎ কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের মোকাবেলায় আসতে চায়।

এটা শুধু মুসলমান বা খৃষ্টানদের বেলাতেই প্রযোজ্য নয়, এটা বরং পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। অবশ্য, 'মনুস্মৃতি' - এর খাঁটি হিন্দু আইনের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সরকারের সেক্যুলার আইনের কোন মিল নেই। তবু, সেখানে জনসাধারণ যে করেই হোক, একটা সমঝোতার অবস্থায় জীবনযাপন করছে।

যদি ধর্মীয় আইনকে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে অনুসরন করা হয় তাহলে পৃথিবীটা অনিবার্যরূপে একটা রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হবে। কিন্তু, মানুষের সৌভাগ্য যে, তেমনটা ঘটেনি।

ইসলামের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে না। কেননা, এ ব্যাপারে যে চূড়ান্ত এবং অনমনীয় নীতি ইসলাম পেশ করে তা হচ্ছে 'নিরংকুশ সুবিচার'-এর নীতি। এই নীতিই হতে হবে সেই সমস্ত সরকারেরও কেন্দ্রীয় ও মৌলিক নীতি, যারা দাবী করে যে, তারা গুণগতভাবে ইসলামিক।

রাষ্ট্রনীতিবিদ্যার ইসলামী ধরাণার এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বিষয়টিকে বুঝতে গিয়ে, অবশ্য আদৌ তা যদি বুঝতে চান, ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা এর খুব সামান্য অনুধাবন করে থাকেন। তাঁরা অপরাধ সম্পর্কিত সাধারণ আইন প্রয়োগের বেলায়, বৈশিষ্ট্যগতভাবে সার্বজনীন ও ধর্মীয় সম্বন্ধহীন কোন অপরাধের সঙ্গে ধর্মের নির্দিষ্ট আদেশাবলীর আওতাভুক্ত কোন অপরাধে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। বস্তুতঃ কোন অপরাধের জন্য যদি কোন ধর্মের সুনির্দিষ্ট

আল্লাহ্ তা'লার কথা এবং কাজের মধ্যে কোনও পরস্পরবিরোধিতা নেই। রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রতি কারো আনুগত্যের মধ্যে কোন সংঘাত নেই ইসলামে। কিন্তু, এই প্রশ্নটা কেবল ইসলামের সঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়।

আইন থাকে, তবে তা কেবল সেই ধর্মেরই অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে, সেভাবেই তাদের বিচার চলবে।

এই উভয় শ্রেণীর অপরাধকে পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এক্ষেত্রে এমন একটা বিরাট ধূসর এলাকা রয়েছে, যেখানে সাধারণ বা 'কমন' অপরাধগুলোর সঙ্গে ধর্মীয় ও নৈতিক প্রশ্নও যেমন জড়িত, তেমনি জড়িত সর্বগ্রাহ্য মানবীয় নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত নোংরা কাজ বা অপরাধের বিষয়টিও। একইভাবে, খুন, মদ্যপান ও জন-বিশৃংখলার প্রশ্নও আছে, এই সব অপরাধের জন্য কোন কোন ধর্মে সুনির্দিষ্ট শাস্তি প্রদানেরও বিধান রয়েছে।

অতএব, প্রশ্ন উঠে যে, রাষ্ট্র এই সকল অপরাধের নিষ্পত্তি কীভাবে করবে? এই প্রশ্ন থেকেই আবার প্রশ্ন উঠবে যে, ইসলাম এক্ষেত্রে এমন কোন সুস্পষ্ট এবং সুসংজ্ঞায়িত ফর্মুলা দেয় নি, যা সমস্ত মুসলিম সরকারের জন্য অবশ্য গ্রহণীয়; এবং অনুরূপ কোন ফর্মুলা অমুসলিম সরকারগুলোর জন্যেও দেয় কিনা, যা তাদের জন্য গ্রহণীয়? ইসলামে যদি অনুরূপভাবেই মুসলিম সরকারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়ও, তাহলেও আরও অনেক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে। যেমন, সেই রাষ্ট্রের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে, যে রাষ্ট নিজেকে কোন নির্দিষ্ট ধর্মের আদেশের অধীন মনে করে এবং নিজের অনুসৃত ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষাকে তার সকল নাগরিকের ওপরে আরোপ করে, তা সেই নাগরিকরা সকলে সেই ধর্মের অনুসারী হোক, বা না হোক।

ধর্মের একটা কর্তব্য হচ্ছে নৈতিক বিষয়গুলোর প্রতি আইন পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তবে, এর কোন প্রয়োজন নেই যে, সমস্ত আইন প্রণয়নকেই ধর্মের এখতিয়ারের আওতাধীনে আনতে হবে।

এত বেশী ফের্কা বা সম্প্রদায়, এবং এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের তারতম্য, এবং এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিশ্বাসের পার্থক্যের পরিণতি তো স্রেফ বিভ্রান্তি ও নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, মদ্যপান নিষিদ্ধ, তবু এজন্য শাস্তি কি হবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা নেই কুরআন করীমে। এজন্য কিছু কিছু হাদীসের ওপরে নির্ভর করা হলেও, তার সঠিকত্বকে আইন শাস্ত্রের বিভিন্ন গোষ্ঠী চ্যালেঞ্জ করে থাকে। এক এলাকায় বা দেশে শাস্তি এর রকম, অন্য এলাকায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার তো কোন কম্‌তি নেই কোথাও। ইসলামের ক্ষেত্রে যা সত্য, তা তো অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য। তালমুদের আইনের প্রয়োগ তো বস্তুতঃ সম্ভবই নয়। খৃষ্টানিটির অবস্থাও তদ্রূপ।

সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) আইনের অধীনে যে কোন ধর্মের যে কোন অনুসারী তার ধর্ম পালন করতে পারে। তার সত্য বলবার ক্ষমতার ওপরে রাষ্ট্রীয় আইনের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই সে সত্যকে মেনে চলতে পারে। সে তার এবাদত-বন্দেগী বা উপাসনা করতে পারে এবং তার উপাসনার আচার-অনুষ্ঠানাদিও পালন করতে পারে, এক্ষত্রে অনুমতির জন্য কোন নির্দিষ্ট আইন পাশ করার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

এই প্রশ্নটিকে আরও একটা দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করা যেতে পারে। ইসলাম যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর মুসলিম সরকারগুলোকে ইসলামী আইন অনুযায়ী দেশ শাসনের অধিকার দেয়, তাহলে নিংকুশ সুবিচারের মানদন্ডে ইসলামকে অন্যান্য দেশগুলোর অন্যান্য সরকারগুলোকেও এই অধিকার দানে সম্মত হতে হবে যে, তারাও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ধর্মের আইন অনুযায়ী শাসন করবে। সুতরাং নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রতিটি নাগরিকের জন্য হিন্দু আইন প্রযোজ্য হবে। এমনটি হলে, তা হবে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের জন্য এক অতি মর্মান্তিক অবস্থা। তারা তখন সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকবার যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তাছড়া, ভারত যদি 'মনুস্মৃতি'র আইন দ্বারা শাসিত হয়, তাহলে ইসরাঈল কেন পারবে না 'তালমুদের' আইন দ্বারা ইহুদী ও অইহুদী সবাইকে শাসনে করতে? এমতাবস্থায় ইসরাঈলী জনগণের জীবন তো চরমভাবে দুর্বিসহ হয়ে ওঠবেই, সেই সঙ্গে খোদ ইহুদীদেরও একটা বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর অবস্থা একই রকম হবে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের এই ধারণাটা ইসলামে কেবল তখনই একটা বৈধতা পেতে পারবে, যখন তা এই ধারণাটিও পেশ করবে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ইসলামী শরীয়াহ্‌কে আইন করেই প্রবর্তন করতে হবে। কিন্তু, এতে আবারও একটা আপাতঃ বিরোধী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। কেননা, এতে করে, একদিকে, নিরংকুশ সুবিচারের নামে, সকল রাষ্ট্রকেই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের আইন প্রয়োগের অধিকার দিতে হবে। অপরদিকে, পৃথিবীর দেশে দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিটি কাজকর্মই এমন একটি ধর্মের কঠোর শাসনের মধ্যে পড়বে, যে ধর্মে তাদের বিশ্বাসই নেই। এটা হবে তখন নিরংকুশ সুবিচারের ধারণার প্রতি একটা প্রকাশ্য অবমাননা।

এই উভয় সংকট অবস্থাটার প্রতি তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ইসলামী আইনের প্রবক্তারা না কোন দৃষ্টি দিয়েছে, না তার সমাধানকল্পে কোন প্রচেষ্টা নিয়েছে। ইসলামী শিক্ষাকে আমি যতটা বুঝি তদনুসারে, সমস্ত রাষ্টকেই পরিচালিত করতে হবে নিরংকুশ সুবিচারের নীতির ভিতিতে। আর এটা যদি করা হয়, তাহলে প্রতিটি রাষ্ট্রই পরিনত হবে মুসলিম রাষ্ট্রে।

এই সমস্ত যুক্তিতর্ক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই-এই বহু আলোচিত নীতির প্রেক্ষিতে এটা বোধ করি পরিস্ফুট হয়ে ওঠেছে যে, কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে ধর্মের পক্ষে আইন প্রণয়নের সর্ব প্রধান অথরিটি হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

(বিশ্বশান্তি : সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান পুস্তক থেকে উদ্ধৃত)

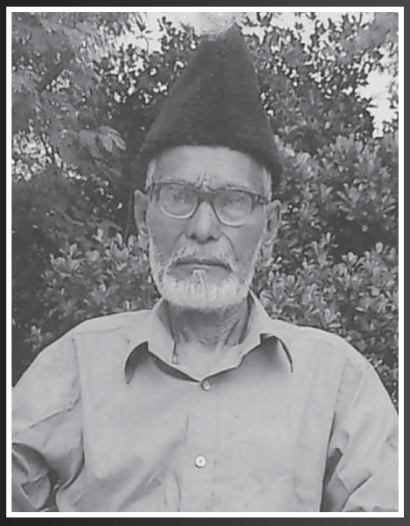

একজন কলাম সৈনিকের অন্তিম যাত্রা

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একজন একনিষ্ঠ সেবক ও কলাম-সৈনিক জনাব ***সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী*** গত ১৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ রোজ শনিবার রাত ৯:৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ২ কন্যা, ৩ নাতি-নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুম চুয়াডাঙ্গা, সন্তুষপুর জামা'তে বিভন্ন সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম হিসেবে তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিয়মিত পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় লেখা-লেখি করতেন। তার এসব লেখার মাধ্যমে সত্য যেভাবে ফুটে উঠত, তেমনি পথহারা মানুষও সঠিক পথের দিশা পেতেন।

বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া থানাধীন রূপসা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯২৭ সালে ***সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরীর*** জন্ম। তার বয়আত গ্রহণ সম্পর্কে তিনি তার এক লেখায় উল্লেখ করেন–

১৯৪৫ সনে যুদ্ধ-শেষে চাকুরী করবো কি করবো না, ইত্যাদি ভাবনা নিয়ে কয়েক দিনের জন্য বাড়ীতে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম দিন দুই পরে ঢাকার পথে কলকাতা হয়ে বোম্বে যাব। যাবার পথে ঢাকায় আমার কোন এক আত্মীয়ের বাসায় দু-এক দিন থেকে যাব মনস্থির করেছি। ইতোমধ্যে একদিন বেতাল নিবাসী আব্দুস সামাদ নামে আমার এক প্রাইভেট-শিক্ষকের সাথে দেখা! কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি আমাকে বললেন, তুমি যখন ঢাকায় যাচ্ছ, তখন মির্জা আলীর কাছে আমার একটি চিঠি নিয়ে যাও, তাকে আমার এই চিঠি দিবে। এই বলে ইংরেজীতে একটি চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন।

শুনেছি মির্জা আলী সাহেবও নাকি তাঁর ছাত্র। নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করলাম মঠখোলা থেকে, গয়নার নৌকা যোগে, গয়নার নৌকার ভিতর নানান জায়গার নানান লোক, তন্মধ্যে কয়েকজন আলেম, কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র, বাকী সবাই গরুর ব্যাপারী। তারা যাচ্ছেন মিরপুর, গরু কিনার জন্য। বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় গয়নার নৌকাখানি বেশ সরগম হয়ে উঠলো । প্রথমে আলাপ পরিচয়, তারপর গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে উঠলো কাদিয়ানীদের কথা।

কেউ বললেন, কাদিয়ানী একটি নতুন ধর্ম, তারা হযরত রাসূল করীম (সা.)কে 'শেষ নবী'- বলে মানে না। কেউ বললেন কাদিয়ানী-ধর্ম খ্রিষ্টানদের একটি শাখা, বিভিন্ন লোভ লালসার মাধ্যমে লোকদেরকে ভুলিয়ে ভ্রান্ত পথে চালিত করছে। 'কাদিয়ানী'-নামটা যে প্রকৃতপক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নাম নহে, 'কাদিয়ানী' কথাটা যে তাদের সঠিক নাম নয়, এটা যে একটি স্থানের নাম এবং এটা যে নতুন কোন ধর্মও নয় বা খ্রিষ্টানদেরও শাখা নয়, বরং এটা মৃতপ্রায় ইসলামকে সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে দিয়ে পুনর্জীবন্ত করে তুলছে, তা তখন আমি জানতাম না। আমি তাদের মুখে শুনে মনে করলাম যে, এটি হয়তোবা খ্রিষ্টানদের বহুবিধ শাখার মধ্যে একটি।

তাদের কথার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন-এমন কয়েকজনের নামও নিলেন তারা। তাদের মধ্যে আমার সুপরিচিত এবং আত্মীয় জনাব মির্জা আলী আকন্দ বি.এস.সি সাহেব একজন। তার প্রশংসাও করলেন পঞ্চমুখে। দোষের মধ্যে এইটুকুই বললেন যে, কাদিয়ানী-ধর্ম গ্রহণ করে খুবই খারাপি করে ফেলেছেন তিনি। জনাব মির্জা আলী আকন্দ সাহেবের কথা শুনে ভাবলাম, যা হউক তিনিই যখন এই ধর্মের, তখন তার কাছ থেকে নতুন ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জানতে পারবো। জনাব মির্জা আলী আকন্দ সাহেবকে খ্রিষ্টান ভেবেই ঢাকায় এসে সর্বপ্রথমে আমি তাঁর বাসায় গেলাম। তখন তিনি থাকতেন ঢাকেশ্বরী কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার জে, ৩নং বাসায়।

তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। সেদিন তাঁর বাসায় রাত-যাপন করলাম। কিন্তু কোন প্রকার আলাপ আলোচনা হলো না তার সাথে। সকাল বেলায় তখনও আমি শুয়ে আছি। চেয়ে দেখি মির্জা আলী সাহেব 'আল্লাহু আকবার'-ফজরের নামায পড়ছেন। তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখে আমার মনে খটকা লাগলো যে, এ আবার কেমন ধারার খ্রিষ্টান, খ্রিষ্টানগণ তো নামায পড়ে না। তিনি নামায পড়েই বের হয়ে কোথায় চলে গেলেন, জানি না। মনের খটকা যেন ক্রমশঃ প্রকট হতে লাগলো আমার।

ভাবলাম, এর একটা মীমাংসা না করে কলকাতা বা বোম্বে যাব না। হাত মুখ ধুয়ে চা-নাস্তা খেয়ে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। চেয়ে দেখি টেবিলের ওপর এলোমেলো ভাবে পড়ে আছে বেশ কয়েকটি পুস্তক। একটি পুস্তক টেনে নিলাম। পুস্তটির নাম হাদীসুল মাহ্‌দী। লিখেছেন আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব। আরবি উর্দু লিখা আমি পসন্দ করতাম না। অর্থাৎ তখন আমি কুরআনকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। তাই উক্ত পুস্তকে আরবি উর্দুর সমাবেশ দেখে আমার মন বসতে চাইল না উক্ত পুস্তকের ভিতর। আনমনাভাবে শুধুই ওলট পালট করে যেতে লাগলাম। আরেকবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এমন একটি জায়গায়, যেখানে পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে খ্রিষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আ.) এর মৃত্যু প্রমাণ করা হয়েছে।

শেষ যুগে যাঁর আগমন হবার কথা আছে, তিনি খ্রিষ্টানদের যীশু (ঈসা আ.) নহেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত থেকেই উম্মতি-নবী আবির্ভত হবেন। উক্ত পুস্তকে হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে প্রথমতঃ আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। কেননা এ-যে নতুন কথা। চোখটাকে ভাল করে কচলিয়ে নিলাম। ভুল-টুল তো দেখেছি না? এই জীবন্ত কথা পেয়ে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো আরো জানান জন্য। কলকাতা বা বোম্বে যাওয়া হলো না। উক্ত পুস্তকের নামখানা নোট করে ফিরে এলাম বাড়ী। তখন মৌলবী মরহুম আবু সুসা সাহেব, ভূতপূর্ব মোয়াল্লেম, মৌলবী আবু তাহের সাহেব, সদর মোয়াল্লেম, আরো অন্যান্য ভ্রাতাগণ ত্রিপুরারাজ্যের বাল্লা নামক স্থান থেকে হিজরত করে সবে-মাত্র কটিয়াদী এসেছেন, কিন্তু আমার সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্যেশ্যেই আমি কটিয়াদী গেলাম। চা পানের উদ্দেশ্যে আমি কোন এক চায়ের ষ্টলে বসেছি। এমন সময় ষ্টলের মালিক বলে উঠলো, 'আপনার বন্ধু মেন্দী মিয়া কাদিয়ানী হয়ে গেছে। নাম তাঁর শামসুল হক, ডাক নাম মেন্দি মিয়া। তিনি অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কটিয়াদী বাজার ছিলো তার হাতের মুঠোয়। মেন্দি মিয়া কাদিয়ানী হয়ে গেছে শুনে, সাইকেল যোগে আমি তার বাড়ী গেলাম, তখন বেলা দুটো। মেন্দি মিয়া তার আম গাছের ছায়ায় জায়নামায পেতে যোহরের নামায পড়ছিলেন।

আমি তাকে নামায পড়তে দেখে অবাক হলাম। নামায শেষে করে ছালাম ফিরিয়ে তিনি আমাকে বললেন, কি দেখছো? সেই মেন্দি মরে গেছে। অর্থাৎ তিনি তার পূর্ববর্তী নোংরা চরিত্রকে ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়েছেন। তখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ছিলো হালুয়া পাড়া। প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরুহুম কুদরত উল্লাহ্ মুন্সী সাহেব। মেন্দি মিয়ার বাড়ী থেকে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে উভয়ে গেলাম হালুয়া পাড়া। উদ্দেশ্য হাদীসুল মাহ্‌দী পুস্তকটি সংগ্রহ করা। জনাব মেন্দি মিয়া জনৈক আহমদী ভ্রাতার নিকট থেকে 'হাদীসুল মাহ্‌দী' পুস্তকটি সংগ্রহ করে আমাকে দিলেন। পুস্তকটি নিয়ে আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন রাত্রি আটটা। আমি মনোযোগের সহিত বহুবার পাঠ করলাম পুস্তকটি। খ্রিষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আ.) এর মৃত্যুর অকাট্য প্রমাণ তো পবিত্র কুরআন পড়ে পেলাম, কিন্তু এই ব্যক্তি, অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত আখেরী যামানার ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবী করেছেন, তাঁর সত্যতা নিরূপন করি কিরূপে, এ সমস্যার সমাধান আমাকে কে করে দিবে?

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে দু'হাত তুলে মাহন আল্লাহ্ তাআলার দরবারে করণা ভিক্ষা করলাম। হে দয়ালু প্রভু? তোমার এ অধম বান্দাকে তোমার সরল এবং সঠিক পথে চালিত কর এবং ভ্রান্ত পথ থেকে তুমি অধম দাসকে ফিরিয়ে রাখ। এই ব্যক্তি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) সত্যই তোমার প্রেরিত ইমাম মাহ্‌দী কিনা, আমাকে চিনিয়ে দাও। কায়মনোবাক্যে তিন বার এমনিভাবে বলে আমি শুয়ে পড়লাম। মহান আল্লাহ্ তা'লা যেন এই অধমের ডাক শুনলেন, শুধু শুনলেনই না, এই অধমের সাথে কথাও বললেন। স্বপ্নে দেখলাম, ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার বহু জলন্ত নিদর্শন পেয়ে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর দাবীকে সত্য জেনে, বুঝে, স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে ১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাসে আমি বয়আত গ্রহণ করলাম। এজন্য সকল প্রশংসা মহান প্রভু আল্লাহ্ তা'লারই। এখন আমি বলতে পেরেছি যে, কিসে আমি সৌভাগ্যবান। জীবনে আল্লাহ্ তা'লার বহু নিদর্শন দেখেছি। উপরোক্ত নিদর্শনাবলী হলো আহমদীয়াত জীবনের প্রথম। আসল কথা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা একজন আছেন। তিনি চিরঞ্জীব। বান্দার ডাক তিনি শুনেন ও বান্দার ডাকে উত্তর দিয়ে থাকেন।

আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের মুখপত্র 'পাক্ষিক আহমদী'-র পক্ষ থেকে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাতের উচ্চ মোকামে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি সেই সাথে মরহুমের পরিবারবর্গকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি আর মহান আল্লাহ্ মরহুমের পরিবারবর্গকে ধৈর্য ধারন করার তৌফিক দান করুন এজন্য দোয়া করছি, আমীন।

'পাক্ষিক আহমদী'-র কর্মীবৃন্দের পক্ষে
সম্পাদক

তৌহিদ প্রচার ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)

খন্দকার আজমল হক

(২য় ও শেষ কিস্তি)

এখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইসলাম তথা তৌহিদ প্রচার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন আরবের লোকেরা লাত, মানত, উজ্জা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা করত, কাবা শরীফে তখন ৩৬০ টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল। সারা আরব মদ, জুয়ার ব্যবহারের এবং ব্যাভিচারে ছেয়ে গিয়েছিল। নারীজাতির কোন মর্যাদা ছিল না। কন্যা সন্তান হলে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। তাই সেই যুগকে 'আইয়ামে জাহেলীয়াত' বলা হতো।

বাল্যকাল হতেই রাসূল করীম (সা.) শান্ত প্রকৃতির, সদাচারী ও সত্যবাদী ছিলেন। তাঁর সততার জন্য মক্কাবাসীরা তাকে 'আল আমিন' বা সত্যবাদী, বলে ডাকত। অবশ্য তখন মক্কায় এমন লোকও ছিলেন যারা মানুষের দুর্দশা দেখে তাদের উপকারের জন্য 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। যৌবনকালে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ও এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন।

বয়:প্রাপ্তির পর হতেই তিনি মানুষের দুর্দশা দেখে ব্যথিত হতেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন ৩০ বৎসর, তখন তিনি মক্কার নিকটস্থ হেরা গুহায় আল্লাহ্‌র আরাধানায় মগ্ন হন। ৪০ বৎসর বয়সে আল্লাহ্‌র নিকট হতে প্রথম তিনি এই ওহী লাভ করেন : "ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাজি খালাক। খালাকাল ইনসানা মিন আলাক।" (৯৬: ২-৩)। অর্থ "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন ইনসানকে এক আঠালো জমাট রক্তপিন্ড হতে।" এর সঙ্গে নাযেল হয় আরও কয়েকটি আয়াত। তখন ভয়ে তাঁর শরীরে কম্পনের সৃষ্টি হয়। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর স্ত্রী খাদিজার নিকট গমন করেন। হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর এরূপ অবস্থা দেখে তাঁকে কম্বল দ্বারা আবৃত করেন। তখন নাজেল হয়, 'হে পোষাকাবৃত ব্যক্তি! তুমি ওঠ এবং সতর্ক কর এবং তোমার প্রতিপালকের মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।"

এরপর ধীরে ধীরে তার ওপর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযেল হতে থাকে। তাঁকে জানানো হয় যে, আল্লাহ্ এক এবং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। এবাদতের পাত্র একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র ইবাদত না করে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা না করার জন্য তাদেরকে সতর্ক করা হয়।

প্রথমে তিনি নিজ বন্ধু-বান্ধবদের নিকট আল্লাহ্‌র একত্ব ও তাঁর রেসালাত প্রচার করতে থাকেন। তাঁর দাবী মেনে নেন প্রথমে তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত বেলাল (রা.)। হযরত আলী (রা.) যখন বয়আত করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন একজন ক্রীতদাস।

প্রথম প্রথম মক্কার লোকেরা তাঁর দাবী উপেক্ষা করে হাসাহাসি করত। কিন্তু ক্রমেই যখন রাসূলুল্লাহ্‌র অনুসারীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন সেখানকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা শংকিত হয়ে পড়ে, এবং রাসূলুল্লাহ্‌র অনুসারীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। বিশেষত ক্রীতদাস ও নারীদের ওপর। কিন্তু তারা শত অত্যাচার সত্বেও তৌহিদের ওপর বিশ্বাস হারায়নি। হযরত বেলাল (রা.) এর প্রভু উমাইয়া তাঁকে খালি গা করে উত্তপ্ত বালুকার ওপর চিৎ করে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে বলত, এখনও মুহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর। তবুও হযরত বেলাল (রা.) বলতেন, 'আহাদুন, আহাদুন, "অর্থ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক।"

প্রায় তিন বৎসর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গোপনে তৌহিদের বাণী প্রচার করতে থাকেন। এ সময় নাযেল হয়- "এবং তুমি (সর্বপ্রথম) নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।" (২৬: ২১৫) তখন তিনি মক্কার নিকটস্থ সাফা পর্বতের ওপর দাঁড়িয়ে কোরেশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে পর্বতটির পাদদেশে সমবেত হবার আহ্বান জানান। তাঁরা সমবেত হলে তিনি বললেন– "আমি যদি বলি এই পর্বতের অপর পার্শ্বে শত্রু-সৈন্য মোতায়েন আছে, তবে তোমরা কী তা বিশ্বাস করবে?" তখন তারা বলল, "হ্যাঁ, হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, আল্লাহ্ এক এবং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাদের সতর্ক করে বলেন, তারা যদি তাঁর শিক্ষা গ্রহণ না করে, তাহলে আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের পাকড়াও করবে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌র এক চাচা আবু লাহাব বলল, "এ জন্যই কি তুই আমাদেরকে ডেকেছিস?" এই বলে সে এবং তার সঙ্গে অন্যান্যরাও সেখান হতে প্রস্থান করল।

রাসূল করীম (সা.) প্রত্যাখ্যাত হলেও দমলেন না। তিনি তাঁর ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করতেই থাকলেন। এতে তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই চলল। একবার যখন তিনি কাবাগৃহে নামাযরত ছিলেন, তখন তাঁর পিঠের ওপর উটের নারি-ভুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে উদ্ধার করেন। তাঁর এক মহিলা অনুসারীকে হত্যা করা হয়। আরও অনেককে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়।

এতদসত্ত্বেও যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকে, তখন কোরেশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাদের সর্দার আবু তালেবের নিকট সে বলল, "আপনি আমাদের নেতা, আপনার জন্য আপনার ভাতিজাকে কিছু বলিনা। আপনার ভাতিজাকে বলুন, সে কী চয়। যদি সে সম্মান চায় তবে আমরা তাকে আমাদের নেতা বানাব। যদি সে ধন সম্পদ চায়, তবে আমরা তাকে আমাদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ দিতে রাজি আছি। যদি সে বিবাহ করতে চায়, তবে মক্কার যে কোন যুবতির নাম সে

বলুক, আমরা তাকে তার সঙ্গে বিবাহ দেব। আপনি তাকে বুঝান, সে যেন আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে। তখন তার সহিত আমাদের কোন বিরোধ থাকবে না। আপনাকে আমাদের দুটো প্রস্তাবের একটাকে মেনে নিতে হবে। হয় আপনি তাকে ছাড়বেন, অন্যথায় আমরা আপনার নেতৃত্ব অস্বীকার করে আপনাকেই ছাড়ব।"

নেতাদের একথা আবু তালেব রাসূল করীম (সা.) কে জানালে তিনি উত্তর দেন, "চাচাজান, আমি বলছি না যে আপনি তাদেরকে ছাড়ুন এবং আমার সাথেই থাকুন। আপনি নির্দ্বিধায় আমাকে ছাড়তে পারেন। কিন্তু আমি এক আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যদি সূর্যকে আমার ডানে এবং চন্দ্রকে আমার বামে এনে খাড়া করে দেওয়া হয়, তবুও আমি আমার আল্লাহ্‌র একত্বের বাণী প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পারব না। আমি আমার কাজ করে যেতেই থাকব যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয়। আপনি আপনার অবস্থা নিজেই ঠিক করে নিন।"

তাঁর এই ঈমান উদ্দীপক ও তেজোদীপ্ত উত্তর আবু তালেবের চোখ খুলে দিল। ঈমান না আনলেও তিনি হুযূর পাক (সা.)-কে বললেন, "হে আমার ভাতিজা! যাও তুমি তোমার নিজের কাজ করে যাও। জাতি যদি আমাকে ছাড়তে চায় ছাড়ুক, আমি তোমাকে ছাড়ব না।" [নবীনেতা, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ রা. প্রণীত নবীওঁকা সারদার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ থেকে উদ্ধৃত]। তৌহিদ প্রচারে তিনি যে কত দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, ওপরের উদ্ধৃতিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মক্কার নেতাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় রাসূল করীম (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর তাদের ক্রোধ এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে যে, হুযূর পাক (সা.) মক্কার মুসলমানদের পার্শ্ববর্তী দেশ আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে নির্দেশ প্রদানে বাধ্য হন।

অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করেও যখন মুসলমানদের বিশ্বাসে ফাটল ধরানো গেল না, তখন মক্কবাসীগণ তাদের বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সময় হুযূর পাক (সা.) তাঁর পরিবার ও অনুসারীগণসহ নিকটবর্তী একটি উপত্যকার আশ্রয় গ্রহণ করেন যা আবু তালেবের উপত্যকা বলে পরিচিত ছিল। সেখানে মক্কাবাসীগণ তাঁদের অবরোধ করে রাখে। এ সময় তাদের কঠিন কষ্টে দিন যাপন করতে হয়। কারণ একে তো বয়কট অবস্থা, তার ওপর তাদের নিকট না ছিল কোন টাকা পয়সা, না ছিল কোন খাদ্যসামগ্রী বা অন্য কোন মালামাল। এই অবরুদ্ধদের মধ্যে হযরত আবু তালেব ও হযরত খাদিজাও ছিলেন। এই অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রায় তিন বৎসর অসীম দুঃখ কষ্টের ভিতর কালাতিপাত করতে হয়। পরে কয়েকজন প্রভাবশালী মক্কাবাসীর সহায়তায় অবরুদ্ধগণ মুক্তিলাভ করেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে হযরত আবু তালেব ও হযরত খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত আবু তালেব ও হযরত খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাথার ওপর কেউ না থাকায় এবং অবরুদ্ধ অবস্থায় মক্কাবাসীদের সহিত যোগাযোগ বন্ধ হওয়ায় তারা তাদেরকে উপেক্ষা করতে থাকে। এমনকি তারা মুসলমানদের সহিত বেশী কথা বার্তাও বলত না। ফলে তাদের ভিতর তবলীগের সুযোগও কমে আসে।

এমতাবস্থায় হুযূর পাক (সা.) মক্কাবাসীদের পরিবের্ত পার্শ্ববর্তী শহর তায়েফে হযরত যায়েদ (রা.)-সহ গমনের সিদ্ধান্ত নেন, যেন তিনি তায়েফবাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে পারেন। কিন্তু তায়েফবাসীগণও তাঁর কথা শুনতে রাজি হল না। বরং তারা ছেলেপেলেদের নিয়ে তাদের ধাওয়া করে এবং তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে রক্তাক্ত করে ফেলে। তাঁরা আহত হয়ে তায়েফের পার্শ্ববর্তী ২ জন মক্কাবাসীর মালিকানাধীন একটি আঙ্গুর বাগানে আশ্রয় নেন। তাঁদের এই অবস্থা দেখে বাগানের মলীকগণ কিছু আঙ্গুর দিয়ে তাদের এক গোলামকে পাঠান। হুযূর পাক (সা.) সেই গোলামকেও তবলীগ করতে থাকেন। সে ছিল খ্রিষ্টান। এ সময় একজন নবী আসার কথা সেও শুনেছিল। হুযূর (সা.) এর তবলীগে সে অভিভুত হয়ে পড়ে এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় হুযূর (সা.) এর পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

মক্কা ও তায়েফবাসীগণ যখন রাসূল পাক (সা.) এর কথা শুনতে রাজি হল না, তখন তিনি অন্যভাবে তবলীগ চালাতে সিদ্ধান্ত নেন। তখন মক্কায় হজ্জ প্রথা চালু ছিল। আরবের বিভিন্ন স্থান হতে লোকগণ মক্কায় হজ্জ করতে আসত। হুযূর পাক (সা.) তখন তাদের নিকট তৌহিদের বাণী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেন। এরূপ এক হজ্জ-মৌসুমে তিনি তবলীগের উদ্দেশ্যে হজ্জের ময়দানে পায়চারি করছিলেন। এ সময় ইয়াসরেববাসী কয়েকজনকে একত্রিত দেখতে পান। উল্লেখ্য, বর্তমান মদীনা নগরী তখন ইয়াসরেব নামে পরিচিত ছিল। হুযূর (সা.) ইয়াসরেব যাবার পর তা মদীনাতুন নবী বা মদীনা নামে অভিহিত হয়। ঐ ইয়াসরেববাসীদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি তাদের নিকট ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। পূর্বেই তারা মদীনার ইহুদীদের নিকট একজন নবী আসার কথা শুনেছিল। এজন্য তারা হুযূর পাক (সা.) এর কথা আগ্রহের সহিত শুনতে থাকে। তাঁর কথায় তারা এতই আকৃষ্ট হয় যে, এক সময় তারা তাঁর ওপর ঈমান আনে এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। পরবর্তী বৎসর আরও কিছু লোক হজ্জ করতে আসে। তারা পূর্ববর্তী বৎসরের নওমুসলিমদের নিকট হুযূর পাক (সা.)-এর কথা শুনেছিল, এজন্য তারা তাঁর সহিত দেখা করে এবং তাঁর কথা শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করে। হুযূর পাক (সা.) তাদের ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করলে তারা তাঁর ওপর ঈমান এনে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে। মদীনায় গিয়ে তারা অন্যান্যদের নিকট ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকে। কিন্তু তারা সংখ্যায় কম হওয়ায় এবং ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ কিছু না জানায় লোক মারফত কাউকে পাঠানোর আবেদন জানায়। হুযূর পাক (সা.) তখন মদীনায় তবলীগ ও ইসলাম শিক্ষা দানের জন্য হযরত মুসআব (রা.)কে সেখানে পাঠান। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মোবাল্লেগ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তবলীগের ফলে আরও অনেক মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। তৃতীয় বৎসর মদীনার হজ্জের কাফেলার লোকদের নিয়ে হুযূর পাক (সা.)-এর সহিত আকাবা নামক স্থানে দেখা করে। তিনি তাদেরকে তবলীগ করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। তারা তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে ও সন্তুষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এটাই আকাবার প্রথম বয়আত নামে প্রসিদ্ধ।

এ সময় তাঁর নিকট হিজরতের নির্দেশ আসে। তিনি মদীনাতে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আগত নওমুসলিমদের নিকট জানতে চান যে, তারা ইসলাম ও তিনিসহ তাঁর অনুসারীদেরকে আশ্রয় দিতে রাজি আছে কি-না। মদীনাবাসীগণ এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে। হুযূর পাক (সা.) তখন মক্কায় মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেন। অধিকাংশ মুসলমান মদীনায় হিজরত করলে মক্কার কাফেরগণ রাসূল করীম (সা.) কে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সময় এক রাত্রে হযরত আলী (রা.) কে তাঁর বিছানায় রেখে তিনি হযরত আবু বকরসহ

মদীনায় হিজরত করেন।

মদীনায় গেলেও মক্কাবাসীগণ হুযূর পাক (সা.) কে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। তাঁকে ও তাঁর সাহাবাদেরকে আশ্রয় দেওয়ায় মক্কাবাসীগণ মদীনাবাসীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য তারা বারবার মদীনা আক্রমণ করতে থাকে। হযরত রাসূল পাক (সা.) কে এসব যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে হয়। কেননা তখন তিনি ছিলেন মদীনার অবিসংবাদিত নেতা।

যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতে হলেও হুযূর পাক (সা.) তবলীগ হতে বিরত হন নাই। ক্রমেই মদীনা ও তার আশপাশের কাবিলাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে।

খন্দক যুদ্ধের পরের বৎসর হুযূর (সা.) একটি রুইয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন, তিনি নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করবেন। রুইয়াটির তাৎপর্য বুঝতে না পারায় তিনি সেই বৎসরই কাবা তাওয়াফের জন্য পনেরোশ' সাহাবী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। উল্লেখ্য, খন্দকের যুদ্ধে বারশ' মুসলমান অংশগ্রহণ করলেও পরের বৎসর পনেরোশ' সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গী হওয়ায় বুঝা যায় যে, মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

হুযূর পাক (সা.) মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর উট থেমে যায়। তখন তিনি সেখানেই তাঁবু গেড়ে অবস্থান নেন।

মক্কাবাসীগণ জানতে পারল, রাসূল (সা.) মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন তারা তাকে বাধা দেয়ার জন্য মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে মদীনার পথে অনেক দূর যাবার পর যখন তারা সংবাদ পেল, মুসলমানগণ হুদায়বিয়ায় অবস্থান নিয়েছেন তখন তারা মক্কায় ফিরে আসে এবং তাদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে রাসূল করীম (সা.) এর নিকট আলোচনার জন্য পাঠায়। কয়েক দফা তাদের সহিত আলোচনা হয়। কিন্তু মক্কাবাসীরা কোনক্রমেই মক্কায় যেতে দিতে রাজি হয় না। তারা জানায় যে, এ বৎসর তারা মুসলমানদেরকে তওয়াফ করতে দেবে না। পরে অনেক ঘটনার পর মক্কাবাসীদের এক প্রতিনিধির সহিত এক চুক্তিনামা স্বাক্ষর হয়, যা 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে প্রসিদ্ধ। এই সন্ধির শর্তানুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরবর্তী বৎসর মুসলমানগণ কাবা তওয়াফ করতে পারবে। এর সহিত আরও কিছু শর্ত সংযুক্ত হয়।

এই সন্ধির পরে সাময়িকভাবে মদীনায় শান্তি ফিরে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পার্শ্ববর্তী রাজা বাদশাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত নেন। কেননা তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, বিশ্বের সকলের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্যই তাঁর আগমন। এ সময় তবলীগের জন্য বার বার তাঁর নিকট নির্দেশ আসতে থাকে। নির্দেশ হয় ***"ইয়া আইউহার রাসূলু, বাল্লেগ মা উনজিলা ইলায়কা মির রাব্বিকা, ওয়া ইল্লাম তাফয়াল ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু। ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান্নাস।"*** (৫-৬৮) অর্থ- হে রাসূল! তোমার প্রভুর নিকট হতে তোমার প্রতি যা নাযেল করা হয়েছে, তা লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। এবং যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তুমি তাঁর পয়গাম আদৌ পৌঁছালে না। এবং আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের কবল হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফের-জাতিকে হেদায়েত দেন না।

এই উদ্দেশ্যে তিনি লোক মারফত তৎকালীন রোমান সম্রাট (কায়সার) হিরাক্লিয়াস, পারস্য সম্রাট খসরু, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাসি, মিসরের শাসনকর্তা মুফাকিস ও মদীনার নিকটস্থ আমীর বাদশাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। এসকল পত্রে তিনি সকলকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং সতর্ক করে জানান যে, যদি তারা তা গ্রহণ না করে তবে সকলের পাপ তাদের ওপর বর্তাবে। পারস্য সম্রাট খসরু ব্যতীত অন্য সকলেই হুযূর পাক (সা.) এবং তাঁর পত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। কেউ কেউ হযরত রাসূল করীম (সা.) এর ওপর ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করে। খসরু ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করায় আল্লাহ্ তাঁর পুত্র দ্বারা তাকে হত্যা করান।

পূর্বেল্লেখিত হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলির ভিতর একটি শর্ত ছিল, আগামী দশ বৎসরের ভিতর কেউ কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। অন্য একটি শর্ত ছিল, আরব গোত্রগুলির ভিতর যে-কেউ ইচ্ছা করলে হয় মক্কাবাসী, নয় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। শর্তে এও উল্লেখ ছিল যে, কেউ যদি সন্ধির কোন শর্ত ভঙ্গ করে, তবে সন্ধি কার্যকর হবে না। এই শর্তানুযায়ী বনু বকর গোত্র মক্কাবাসীদের সহিত ও বনু খোজায়া গোত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সহিত যোগ দেয়।

পূর্ব হতেই বনু বকর গোত্রের সহিত বনু খোজায়া গোত্রের বিরোধ চলে আসছিল। মক্কাবাসীদের সহিত বনু বকর গোত্র যোগ দেওয়ায় তাদের শক্তি বেড়ে যায়। তারা এই সুযোগ গ্রহণ করে। মক্কাবাসীরা চুক্তি করলেও চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। তাই বনু বকর গোত্র যখন বনু খোজায়া গোত্রের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মক্কাবাসীদের সাহায্য চাইল, তখন উভয় বাহিনী একত্র হয়ে বনু খোজায়া গোত্রকে আক্রমণ করে তাদের অনেককে হত্যা করে ফেলে। এভাবে মক্কাবাসীগণ রাসূল করীম (সা.) এর আশ্রিতদেরকে আক্রমণ করে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে। বনু খোজায়য়া গোত্র তখন হুযূর পাক (সা.) এর নিকট এসে এ সম্পর্কে জানায়। মক্কাবাসীদের শর্ত ভঙ্গের কারণে মক্কা আক্রমণে কোন বাধা ছিল না।

এ সময় মদীনার আশপাশের গোত্রগুলি ইসলাম গ্রহণ করে। মক্কা অভিযানের জন্য সৈন্য পাঠাতে এই সব কাবিলা বা গোত্রের নিকট বার্তা পাঠানো হয়। ইতোমধ্যে মদীনাবাসীগণ প্রস্তুতি নিয়ে হুযূর পাক (সা.) এর সঙ্গে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে অন্যান্য গোত্রের মুসলমানগণও তাদের সঙ্গী হয়। এই সৈন্যবাহিনী যখন ফারান মরুভূমিতে প্রবেশ করল, তখন তাদের সংখ্যা হয় দশ হাজার। এভাবে তওরাতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়। এই সৈন্যদল মক্কার নিকটবর্তী স্থানে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান নেয়। রাত্রিবেলা হুযূর পাক (সা.) প্রত্যেক তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে নির্দেশ প্রদান করেন।

এদিকে মক্কাবাসীগণ হুযূর পাক (সা.) এর মক্কা অভিযানের খবর পেয়ে কয়েকজন সঙ্গীসহ মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কে খোজ খবর নেওয়ার জন্য আবু সুফিয়ানকে পাঠায়। আবু সুফিয়ান রাত্রি বেলায় সারা মরুভূমিতে আগুনের সমাহার দেখে বিস্মিত হয়ে পড়ে। তারা বলতে থাকে, এত সৈন্য কোথা থেকে এল? তখন পাহাড়ারত হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সৈন্যসহ এখানে অবস্থান করছেন। তখন হযরত আব্বাস (রা.) তাকে সহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হন। আবু সুফিয়ানকে কেউ হত্যা করতে পারে ভেবে হুযূর পাক (সা.) নির্দেশ দেন যে কেউ যেন আবু সুফিয়ানকে হত্যা না করে। আবু সুফিয়ান হুযূর পাক (সা.) এর এই বদান্যতা দেখে মুগ্ধ হন। এরপর হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে নিজ অবস্থানে নিয়ে যান। পর দিন ফজরের নামাযের সময় তিনি মুসলমানদের নামাযের পদ্ধতি দেখে মুগ্ধ হন।

আবু সুফিয়ানদের ভিতর ভাবান্তরের সৃষ্টি হয়। তারা বুঝতে পারে যে, এদেরকে পরাস্ত করা যাবেন না। তখন তারা ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে আবু সুফিয়ানের সাথীরা ঈমান আনে। অনেক ইতস্ততের পর আবু সুফিয়ানও ইসলাম গ্রহণ করে।

হুযূর পাক (সা.) আবু সুফিয়ানকে জানান, হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গের কারণে তিনি মক্কাবাসীদের শাস্তি দিতে এসেছেন। ইতোমধ্যেই তারা মুসলিম সৈন্যদের শক্তির কথা জেনেছিল। তাই তারা তাঁর কথা শুনে ভীত হয়ে পড়ে। আবু সুফিয়ান হুযূর পাক (সা.) কে বললেন, মক্কাবাসীগণ যদি অস্ত্র ধারণ না করে তবুও কী তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে? তিনি বললেন, যারা নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করবে, তারা নিরাপদে থাকবে। তিনি আরও বলেন, যারা আবু সুফিয়ানদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করবে তারা এবং যারা আবু রোয়াইহার ও যারা হযরত বেলাল (রা.) এর ভাইয়ের পতাকা তলে আশ্রয় নেবে তারাও নিরাপদে থাকবে।

এরপর হুযূর পাক (সা.) তাঁর সৈন্যদল নিয়ে মক্কাভিমুখে অগ্রসর হলেন। তাঁর মক্কা পৌঁছানোর পূর্বেই আবু সুফিয়ান সেখানে গিয়ে মক্কাবসীদের মুসলিম বাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আগমনের সংবাদ দেন এবং তাদের সতর্ক করে বলেন, মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার ক্ষমতা কারও নেই।

তিনি মক্কাবাসীদের রাসূল পাক (সা.) এর নিরাপত্তা দানের শর্তগুলিও জানিয়ে দেন। মক্কাবাসীগণ নিজ নিজ গৃহে আশ্রয় নেয় ও দরজা বন্ধ করে রাখে। হুযূর পাক (সা.) তাঁর সেনাবাহিনীসহ বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করেন। এভাবে কয়েক বৎসর পূর্বের হুযূর (সা.) এর দেখা রুইয়ার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়।

রাসূল পাক (সা.) মক্কায় প্রবেশ করে প্রথমেই কাবা শরীফের দেব-দেবীর মূর্তি এবং দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবি ধ্বংস করেন। যার ফলে পূর্ণ হয় সেই কুরআনী ভবিষ্যদ্বাণী, যা হিজরতের পূর্বে নাযেল হয়েছিল। যেখানে বলা হয়েছে, ***"ওয়া কুল যায়াল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিলু, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা"*** (১৭:৮৩)। অর্থ: এবং (তুমি) বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে এবং মিথ্যা দূরীভূত হবারই যোগ্য।"

অত:পর রাসূলে পাক (সা.) মক্কাবাসীদেরকে একত্রিত করে বলেন, তোমরা বল, তোমাদের সেই অত্যাচার ও দুষ্কর্মের কীরূপ প্রতিশোধ তোমাদেরকে দেয়া দরকার, যা তোমরা করেছিলে এক আল্লাহ্‌কে ইবাদতকারী গরীব বান্দাদের প্রতি। মক্কাবাসীরা বলল, "আপনার কাছে সেই ব্যবহার আশা করি, যা ইউসুফ করেছিলেন তাঁর ভাইদের প্রতি।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আজ তোমাদের না কোন শাস্তি দেয়া হবে, না তোমাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে" (নবীনেতা)। যারা রাসূল করীম (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাংঘাতিক অত্যাচার করেছিল, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করে ক্ষমার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। এমনকি যে কয়জনকে তিনি মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন, তাদের কাউকে কাউকে মুক্ত করে দেন। এদের মধ্যে আবু জেহেলের পুত্র ইকরামাও ছিলেন। তাঁর এই ক্ষমার নিদর্শন দেখে মক্কায় অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে মক্কা বিজয় সমাপ্ত হয় এবং সেখানে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়। অত:পর রাসূল পাক মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলেও আরবের বেশ কিছু কবিলা হুযূর পাক (সা.)-এর ওপর ঈমান না এনে তার বিরোধিতা করতে থাকে। এ কারণে তাঁকে তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধও পরিচালনা করতে হয়। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই প্রায় সমগ্র আরব ইসলাম গ্রহণ করে।

হুযূর পাক (সা.) শুধু ইসলামের বাণী প্রচার করেই চুপ থাকেন নি, নও মুসলিমদের তালীম তরবীয়তের প্রতিও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি তাদের তালীম-তরবীয়তের জন্য বিভিন্ন স্থানে তাঁর সাহাবীদেরকে প্রেরণ করেন।

এ সময় তাঁর মৃত্যু আসন্ন বলে জানানো হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে, নবম হিজরীর হজ্জই তাঁর শেষ হজ্জ। এই হজ্জে হুযূর (সা.) যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি মুসলমানদের অনেক নসিহতমূলক কথা বলেন। তিনি দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার এবং নারীদেরকে পুরুষদের ন্যায় সব অধিকার প্রদানের উপদেশ দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সমবেত জনমন্ডলীকে সম্বোধন করে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "এই সমস্ত কথা যা আজ আমি তোমাদের নিকট বলেছি তা তোমরা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিও। কেননা এমনও হতে পারে যে, যারা আজ আমার কথা শুনেছে, তাদের চেয়ে যারা আজ আমার কথা শুনছে না, তারাই এ সকল কথার ওপর বেশি আমল করবে। (নবীনেতা)। এই হজ্জই তাঁর শেষ হজ্জ হওয়ায় এ হজ্জ 'বিদায় হজ্জ' নামে প্রসিদ্ধ।

অতএব জানা গেল যে, হুযূর পাক (সা.)-কে সারাটা জীবন ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যয় করতে হয়। এরজন্য তাঁকে ও তাঁর সাহাবাদেরকে নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এমনকি তাঁকে ও তাঁর সাহাবীগণকে নিজ জন্মভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করতে হয় এবং মক্কার কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করতে হয়। এসব যুদ্ধে অনেক সাহাবী শহীদ হন, অনেককে আহত হয়ে ভীষণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। ওহুদের যুদ্ধে হযরত রাসূল করীম (সা.) দাঁতে আঘাত পেয়ে আহত হয়েছিলেন। তবুও কাফেরগণ তাঁকে ইসলাম প্রচার হতে বিরত রাখতে পারেননি। তাঁর প্রধান কাজই ছিল ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। তাই এটাই ছিল তাঁর প্রধান সুন্নত।

তিনি এমন ধর্ম ও এমন কিতাব এনেছিলেন যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এজন্যই তিনি খাতামান নবীঈন বা নবীদের সর্দার। তাঁর মর্যাদা এত উচ্চ ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করেছেন এবং তাঁর ফিরিশতাগণও। আল্লাহ্ মানুষকেও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাই আসুন আমরাও বলি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদেও ওয়া আলে মুহাম্মদ।

ইসলাম প্রচার সম্পর্কে কুরআন পাকে বর্ণিত কয়েকটি আয়াত এখানে প্রদত্ত হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যাবে যে ইসলাম প্রচারের গুরুত্ব কতখানি।

(১)এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে ও বলে, নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত (৪১:৩৪)

(২)তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক কর, যা সর্বাধিক উত্তম। (১৬:১২৬)

(৩) এবং তোমাকে যে-বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা তুমি লোকদের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা কর এবং মুশরিকদেকে উপেক্ষা কর। (১৫:৯৫)

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এই নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দিন, আমীন।

জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কি, তা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতকগুলো কারণে স্পষ্টীকরণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। জিহাদ সর্ম্পকে নানা প্রকার ভ্রান্ত-ধারনা রয়েছে। জিহাদের প্রকৃত অর্থ কি? আখেরী যুগে অস্ত্রের পরিবর্তে কলমের জিহাদ বলতে কি বুঝায়? আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্ব–ব্যাপী কিভাবে কলমের জিহাদ করে চলেছে তা স্পষ্টভাবে জানা প্রয়োজন। আহামদীয়া মতবাদ এবং অন্যান্য মতবাদের ধ্যান-ধারনা এবং বাস্তব কর্মকান্ডের তুলনা–মূলক বিশ্লেষণ করে দেখা অত্যাবশ্যক। নীতিগত ভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শক্তি–প্রয়োগ করা কি ইসলাম অনুমোদন করে? *'অসি নয় মসি'* দ্বারা ইসলামের পূর্ণ-প্রচার এবং বিরুদ্ধ–বাদীদেরকে পরাস্ত করাই এ যুগের বিশেষ চাহিদা। এ বিষয়গুলো সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করতঃ সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং যথাযথভাবে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলে বিশ্ব–ব্যাপী বিরাজমান সংকটময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব।

(১) প্রথমতঃ জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত-ধারনার দূর করা প্রয়োজন

জিহাদ সম্পর্কে পশ্চিমা জগতে প্রচন্ড আকারের ভ্রান্ত-ধারণা রয়েছে। সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন লোম-হর্ষক ঘটনাবলী এবং জিহাদের নামে খুন-খারাবী এবং রক্তপাত, নৃশংস হত্যাকান্ড,সন্ত্রাসী এবং জঙ্গীবাদী কর্মকান্ড, ইত্যাদি বিষয়াবলী আরও বেশী জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলেছে। 'প্রকৃত জিহাদ' এবং 'জিহাদের নামে রক্তপাতের ঘটনাবলী' এক কথা নয়। বাহ্যতঃ জিহাদের নাম ব্যবহারের অন্তরালে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত-শিক্ষা দ্বারা কখনই সমর্থিত নয়। কতিপয় উগ্রপন্থী মোল্লাশ্রেণীর মুসলিম নেতা এবং তাদের অন্ধ-অনুসারীদের কিছু কর্মকান্ড এবং প্রকৃত-জিহাদ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা এবং অপব্যাখ্যার ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা জগতের কোন কোন পন্ডিত এবং 'ওয়েস্টার্ন মিডিয়া' আরো বেশি উচ্চ কণ্ঠে ইসলাম–বিরোধী মতবাদ প্রচারের সুযোগ পেয়েছে।

(২) দ্বিতীয়তঃ ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী 'জিহাদ'-এর প্রকৃত অর্থ কি?

প্রকৃত প্রস্তাবে জিহাদ কথাটি ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী কি কি অর্থে এবং কোন্ কোন্ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে জানা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে, জিহাদ ***প্রধানতঃ*** তিন প্রকারঃ

(ক) 'জিহাদে আকবর' বা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ, যার দ্বারা আত্মসংশোধন–মূলক সার্বক্ষনিক চেষ্টা–প্রচেষ্টার মাধ্যমে শয়তানী প্ররোচনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বুঝায় (পবিত্র কুরআন ২২:৭৯, ২৯:৭, ৪০:৫৯, ৪৯:১৬, ৪৬:২০)।

(খ) 'জিহাদে কবীর' বা শ্রেষ্ঠ জিহাদ দ্বারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রচার করাকে বুঝায়। সেই উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রচেষ্টা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ–বিশেষতঃ ঐশী নির্দেশিত পথ ও পন্থা অবলম্বন করা এরূপ জিহাদের অন্তর্ভূক্ত। (পবিত্র কুরআন ২৫:৫৩, ২৯:৭০, ১৬:১২৬, ৩:১০৫, ১১১)।

(গ) 'জিহাদে আসগর' বা ক্ষুদতম জিহাদ দ্বারা আত্মরক্ষা–মূলক যুদ্ধ করাকে বুঝায় (পবিত্র কুরআন ২২:৪০-৪১, ২:১৯১-১৯৪, ৪:৭৬, ৪:৯৬-৯৭, ২:৫৫, ৮:৬১, ২:১৭৮, ৮:১৯,৪৬)। কোন প্রকার আক্রমনাত্মক যুদ্ধ বা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী তথা ন্যায়-নীতিহীন হত্যাকান্ড এবং রক্তপাত করার নাম জিহাদ নয়। বলা প্রয়োজন যে, ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুগে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) যে সকল যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেগুলো ছিল একান্তভাবেই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ।

(৩) তৃতীয়তঃ আখেরী যুগে কলমের জিহাদের আবশ্যকতা কেন?

বর্তমানে যুগের মহা–সংকটময় বিশ্ব-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে–বিশেষতঃ দাজ্জালী ফেতনা–ফ্যাসাদ এবং ইয়াজুজ–মাজুজের মহাপ্রলয়ংকরী যুদ্ধ এবং মহাযুদ্ধের ঘটনাবলী এবং ক্রমবর্ধমান রণপ্রস্তুতি–জনিত ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে ইসলামী শিক্ষার আলোকে সত্যিকার প্রতিকার-ব্যবস্থা হলো যুক্তি, জ্ঞান এবং ঐশী–নিদর্শনাবলীর আলোকে সর্বাত্নক চেষ্টা–প্রচেষ্টা এবং যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অস্ত্রের পরিবর্তে কলম দ্বারা সকল মানুষকে প্রধানতঃ জিহাদে আকবর এবং জিহাদে কবীরের দিকে আহ্বান জানাতে হবে ঐশী নির্দেশিত পথ ও পন্থার মাধ্যমে–কোন প্রকার স্বকপোল–কল্পিত এবং স্বঘোষিত পন্থা এবং অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে নয়। কারণ আখেরী যুগের দাজ্জালী-ফিতনা এবং ইয়াজুজ–মাজুজের তান্ডব-লীলা থেকে বাঁচার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)–এর ওপর 'যুদ্ধ রহিত-করণ' (ইয়াজাউল হারব)–এর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এখন সেই যুগ এসে গিয়েছে এবং মহা–সংকটময় বিশ্ব–পরিস্থিতি একথার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে।

ইসলামের শান্তিপূর্ণ পথ ও পন্থার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে কলমের জিহাদ দ্বারাই বিশ্ব–ব্যাপী সংকটময় পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান করতঃ ন্যায় ও কল্যাণমূলক বিশ্ব–শান্তির ভিত্তি রচনা করা সম্ভব–অস্ত্রের বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নয়। বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) বলেছেনঃ "কুরআন করীমে স্পষ্ট আদেশ রয়েছে যে, ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না। দীনের সাক্ষাৎ সৌন্দর্যরাজি,

গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পেশ কর এবং পুণ্য নমুনা ও আদর্শপূর্ণ দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ কর। এ ধারণা কখনও পোষণ করো না যে, সূচনাকালে ইসলামে তলোয়ার ধারণের আদেশ হয়েছিল। কেননা, সে তলোয়ার ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিস্কাসিত হয়নি, বরং দুশমনের হামলা থেকে নিজেদেরকে বাচাঁবার জন্যে অথবা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালানো হয়েছিল। কিন্তু ধর্মের জন্যে বলপ্রয়োগ ও জবরদস্তি করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।" (সিতারা-এ-কায়সারিয়াঃ পৃঃ ১৬)

"আমি জানি না, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোথায় এবং কার কাছে শুনতে পেয়েছেন যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে বিস্তার লাভ করেছে। খোদা তা'লা তো কুরআন করীমে বলেনঃ "লা ইকরাহা ফিদ্দীন" অর্থাৎ 'ইসলামধর্মে জোর জবরদস্তি নেই।' তাহলে আবার কে-ই-বা জবরদস্তির আদেশটি দিল? তাছাড়াও "জবরদস্তি করার মত সাজসরঞ্জামাদি-ই বা কি ছিল?" (পয়গামে সুলেহ, পৃঃ ৫১)

"ইসলামের প্রারম্ভিক কালে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধকমূলক লড়াই এবং দৈহিক যুদ্ধসমূহের এজন্যেও প্রয়োজন পড়েছিল যে, ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারীদের জবাব যুক্তি ও দলিল প্রমাণাদির দ্বারা না দিয়ে বরং তলোয়ারের দ্বারাই দেয়া হতো। সেজন্যে নিরূপায় হয়ে প্রত্যুত্তরে তলোয়ার ব্যবহার করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তলোয়ারের দ্বারা জবাব দেয়া হয় না, বরং কলম এবং যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়। এ জন্যই এ যুগে খোদা তা'লা চেয়েছেন, তলোয়ারের কাজ যেন কলমের দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং লিখনীর দ্বারা মুকাবিলা করে বিরূদ্ধবাদীদেরকে পরাস্ত করা হয়। সেজন্যে, এখন কলমের জবাব তলোয়ারের দ্বারা দেয়ার চেষ্টা–প্রয়াস কারও পক্ষে শোভনীয় নয়। "যদি মওকা ও মর্যাদার তারতম্য রক্ষা না কর, তাহলে পূর্নভাবে নাস্তিক হয়ে পড়বে"। (মলফুযাত, ১খন্ড, পৃঃ ৫৮, ৫৯)

(৪) চতুর্থতঃ অস্ত্রের দ্বারা ইসলাম প্রচারিত হয় নাই

পশ্চিমা জগতে যদিও জিহাদ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, তথাপি অ-মুসলিম, জ্ঞানী–গুণী, পন্ডিত এবং নিরপেক্ষ বিশ্লেষকদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা বিশ্বাস করতেন যে, ইসলাম অস্ত্রের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই। অনুরূপভাবে মুসলিম পন্ডিত ও সুধীজনের অনেকেই একই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত অবশ্যই জিহাদের প্রকৃত-অর্থের ওপর বিশ্বাসী।

(৫) পঞ্চমতঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী কলমের জিহাদ

নীতিগতভাবে এবং বাস্তব-ক্ষেত্রে কিভাবে কলমের জিহাদ পরিচালিত হচ্ছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এমন একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন, যার মূলভিত্তি হলো পবিত্র কুরআনের এবং হাদীসের প্রকৃত শিক্ষানুযায়ী যুক্তি-জ্ঞান, ঐশী-নিদর্শন এবং ঐশী–সাহায্যের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী শান্তি এবং ন্যায়-নীতির ভিত্তি রচনা করা (পবিত্র কুরআন ২৪:৫৬, ৬২:৩-৪, ৬১:১০, ৪৮:২৯-৩০)। আহমদীয়া মুসলমানগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এই মহান কাজ কোন অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, বরং সু-সংগঠিতভাবে শিক্ষা, সংশোধন এবং প্রচার-মূলক (তালীম, তরবীয়ত এবং তবলীগ) কর্ম–প্রচেষ্টার মাধ্যমে করতে হবে। এই ধরনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হলো প্রকৃত জিহাদ। প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) বলেছেনঃ "সায়েফ কা কাম কলম ছে হি দেখায়া হামনে " অর্থাৎ- তরবারির কাজ কলম দ্বারাই দেখিয়েছি আমি। তিনি ৯১ খানা পুস্তক রচনা করত: সকল মতবাদের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন, তাঁর মাধ্যমে বহু ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐশী-ওয়াদা অনুযায়ী খেলাফত ব্যবস্থা পূন:প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আধ্যাত্মিক কর্ম-প্রচেষ্টার বৈশিষ্ট্য সমূহ এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা কতখানি আশা-ব্যঞ্জক তা আলোচনার দাবী রাখে।

(৬) ষষ্ঠতঃ কলমের জিহাদের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা-মূলক কার্যক্রম

আহমাদীয়া মতবাদ এবং অন্যান্য মতবাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ তুলনামূলকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সত্য–সন্ধানী সকল মানুষ তথা বিশ্ব–বিবেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইঃ

(ক) কলমের জিহাদ বনাম অস্ত্রের জিহাদ এবং বিশ্ব–শান্তির রূপরেখা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা, পরমত-সহিষ্ণুতা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কি? (সূরা ফুরকানঃ ৫৩, সূরা নাহলঃ ১২৬, সূরা বাকারা: ২০৬, সূরা আনফাল:৪৩, সূরা মুজাদালাহ:২৩)।

(খ) দাজ্জালী ফিতনার প্রতিকারের জন্য কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা বনাম যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং বাস্তব কর্ম-পন্থা (সূরা কাহাফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস)।

(গ) ইয়াজুজ–মাজুজের ফেতনা থেকে বাঁচবার জন্য কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা বনাম এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং বাস্তব কর্মপন্থা (সূরা কাহাফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস)।

(ঘ) যুদ্ধ-রহিত-করনের জন্য যুদ্ধ-কালীন শর্তাবলী এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত (সূরা হুজুরাত:১০, সূরা মুহাম্মদ:৩৬, সূরা আনফাল:৫৮-৬২)।

(ঙ) ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, বরং কলমের মাধ্যমে তথা যুক্তি-জ্ঞান, ঐশী-নিদর্শনের দ্বারা সংঘটিত হবে। এর জন্য ঐশী প্রতিশ্রুত নেতৃত্বের ব্যবস্থা বনাম স্বঘোষিত নেতার মধ্যে পার্থক্য (সূরা জুমুয়া: ৪, সূরা সাফ:১০, সূরা নুর:৫৬)।

(৭) সপ্তমতঃ ধর্মীয় বিষয়ের জন্য বল-প্রয়োগ নীতি কি ইসলাম-সমর্থিত?

বিভিন্ন স্থানে আহমদীয়া জামা'তের ওপর বর্বরোচিত আচরণ এবং আক্রমনের পরিবর্তে তাদের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যগুলো এবং চ্যালেঞ্জ সমূহের পাল্টা-জবাব প্রদানের জন্য বিগত এক শতাধিক বছর যাবত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সত্যিকার অর্থে এগিয়ে আসে নাই কেন? এ সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি প্রশ্নের সদুত্তর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্যতীত অন্য কারো কাছে আছে কি? কয়েকটি প্রশ্ন হলোঃ

(ক) হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী মোজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কোথায়? (সূরা নূর : ৫৬, সূরা জুমুয়া: ৩-৪, সূরা সাফ: ১০, সূরা ফাতেহ: ২৯-৩০ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের আলোকে)।

হযরত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন "বর্তমান যুগই ছিল মসীহার আবির্ভাবের যুগ। যদি আমি না আসতাম, তাহলে অন্য কেউ অবশ্যই আসতো।" এই প্রশ্নের উত্তর কি?

(খ) মুসলমানদের খলিফা কোথায়? শতধা-

বিভক্ত মুসলিম সমাজকে একতাবদ্ধ করার জন্য প্রতিশ্রুত খেলাফত ব্যবস্থা কোথায়? (সূরা নূর: ৫৬, সূরা আলে ইমরান: ১০৪-১০৬, সূরা আনাম:১৬০, সূরা আনফাল: ৪৭ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসের আলোকে)

(গ) মুসলমানদের মাঝে এত কুসংস্কার, এত দলবাজী, এত ফতোয়াবাজী, এত মারামারি, দূর্নীতি এবং অস্থিরতার করাল গ্রাস এবং প্রচন্ড নৈতিক অবক্ষয় থেকে উদ্ধারের উপায় কি? সত্য কি কখনো অসত্য বা মিথ্যার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? প্রশ্ন হলো ঃ ইসলাম কি তার সৌন্দর্য্য দ্বারা এবং যুক্তি-জ্ঞান (হিকমত) দ্বারা, ঐশী নিদর্শনাবলী দ্বারা অসত্য ও মিথ্যার ওপর বিজয় লাভ করতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। ***প্রশ্ন হলোঃ*** কিভাবে পারবে? (সূরা নাহল: ১২৬, সূরা ফুরকান: ৫৩, সূরা সাফ: ১০, সূরা বনী ইস্রায়েল: ৮২)।

(ঘ) ধর্মীয় পরিভাষার অন্তর্নিহিত এবং রূপক বর্ননার মর্ম্মার্থ না বুঝার কারণে কতকগুলো মারাত্মক ভ্রান্ত-ধারনা এবং প্রচলিত বিশ্বাস এমনভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে, যার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ হযরত ঈসা (আ.) -এর সশরীরে আকাশে যাওয়া এবং কোন এক সময়ে আকাশ থেকে প্রত্যাবর্তন করার কাল্পনিক বিশ্বাসের বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় (অবশ্যই রূপকভাবে এই কথাগুলো ব্যাখ্যা সাপেক্ষে সত্য এবং গ্রহণযোগ্য)।

প্রশ্ন হলোঃ বনী ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আ.)- এর ওফাত এবং রূপকার্থে দ্বিতীয় আগমনের যে সকল অকাট্য যুক্তি-প্রমান ও ব্যাখ্যা এবং বাস্তব-দৃষ্টান্ত আহমদীগণ উপস্থাপন করে আসছে বিগত এক শতাধিক বছর যাবত, সেগুলোর জবাব কেউ দিতে পারছে না কেন? পবিত্র কুরআন হতে একটি আয়াত থেকে 'আকাশ' (আরবীতে সামায়া) শব্দটি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ব্যবহৃত হওয়ার প্রমাণ কেউ দিতে পারবে কি? প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব না দিয়ে অযথা ফেতনা-ফ্যাসাদ এবং ঝগড়া-ঝাটি করা অথবা ভাসা-ভাসা জ্ঞানমূলক কথাবার্তা দ্বারা সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করা কি সভ্য জগতের কোন মানুষের পক্ষে শোভা পায়? স্মর্তব্য যে, আখেরী যুগের আলেমগণ আকাশের নিচে নিকৃষ্টতম প্রাণী বলে পরিচিত হবে তাদের ফেতনা-ফ্যাসাদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার কারণে (হাদীসঃ বায়হাকী ও মিশকাত)।

(ঙ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাধ্যমে ইসলামী-শিক্ষা ও সংশোধন-মূলক কার্যক্রম এবং ইসলামের প্রচারের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত প্রচার কেন্দ্রসমুহ (২০১৩ সন পর্যন্ত ২০৪টি দেশের প্রচার-কেন্দ্র) এবং খেলাফত-ভিত্তিক সুসংগঠিত ব্যবস্থাপনার মোকাবেলায় অনুরূপ শান্তিপূর্ণ কোন প্রোগ্রাম পৃথিবীব্যাপী কোথাও আছে কি? হাজার হাজার জীবন উৎসর্গকারী প্রচারক, কেন্দ্রীয় বায়তুল-মাল ব্যবস্থা, পরামর্শসভা, শান্তিবাদী নীতি ও আদর্শের জন্য বিশ্বব্যাপী সমাদৃত এবং ঐশী-নির্দেশিত পথও পন্থার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারকারী হিসেবে আল্লাহতালা কর্তৃক মনোনীত হওয়ার দাবী-কারক হওয়ার মত আহমদীয়া মুসলীম জামাত ব্যতীত অন্য দাবীকারক আছে কি?

(চ) আহমদী মুসলমানগণ ইসলামের পবিত্র কলেমা ***"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"***-এর ওপর পূর্ণভাবে বিশ্বাসী এবং পবিত্র কুরআনের প্রতিটি সুরা এবং প্রতিটি আয়াতের ওপর বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিরূদ্ধবাদীগণ যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনে অসমর্থ হয়ে কোন কোন স্থানে সরল-মনা জন-সাধারণের কিছু অংশকে কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্ত করতে প্রচেষ্টা চালায়।

ধর্মের ক্ষেত্রে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বল-প্রয়োগ নীতি কি ইসলাম-সম্মত (সূরা বাকারা: ২৫৭, সূরা নহল: ৯৪, সূরা আশ শূরা: ৪৯, সূরা কাফ : ৪৬, সূরা গাশিয়া: ২২-২৩, সূরা জুমুয়া: ৪২, সূরা ইউনুস: ৪২, ১০৯)। বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের একদিনের ঘটনা কি ধর্মীয়-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মত-পার্থক্যের কারণে অত্যাচার অথবা শক্তি-প্রয়োগের অনুমোদন দান করেছে?

অনেকেই বলেন যে আহমদীরা মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-কে 'খাতামান নবীঈন' হিসেবে মানে না। এটা সম্পুর্ণরূপে ভ্রান্ত-প্রচারণা। বরং যারা বিশ্বাস করে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে সশরীরে দুই হাজার বছর যাবত অবস্থান করছেন এবং সেখান থেকে সশরীরে আগমন করবেন (কথাগুলো রূপক অর্থে অবশ্যই সত্য বলে আহমদীরা প্রমাণ করেছে কলমের জিহাদ তথা যুক্তি-প্রমানের আলোকে) তাদের মতে শেষনবী তো হবেন সেই আগমনকারী হযরত ঈসা (আ.)। এই প্রশ্নের কোন উত্তর বিরুদ্ধবাদীদের কাছে নেই। আহমদীদের কাছে এই প্রশ্নগুলোর যথার্থ উত্তর রয়েছে। সেগুলো জানার জন্য সত্য-সন্ধানীদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। ধর্মীয় স্বাধীনতার মূল কথা হলো ***'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'*** ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তী নিষিদ্ধ।

সুতরাং প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব না দিয়ে অযথা ফেতনা-ফ্যাসাদ এবং ঝগড়া-ঝাটি করা অথবা ভাসা-ভাসা জ্ঞানমূলক কথাবার্তা দ্বারা সাধারণ জনগনকে বিভ্রান্ত করা কি সভ্য-জগতের কোন মানুষের পক্ষে গ্রহনযোগ্য হতে পারে ? হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-বার বার ঘোষনা করেছেনঃ "আমরা এই কথার উওপর ঈমান রাখি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং সৈয়দনা মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.)- তাঁর রসূল এবং খাতামূল আম্বিয়া।" (আইয়ামুস সুলেহ)

উপরোক্ত সাতটি বিষয় আরও ভালভাবে বুঝার জন্য এবং উম্মুক্ত হৃদয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বরাতসহ উল্লেখ করা হলো।

প্রকাশিত হয়েছে

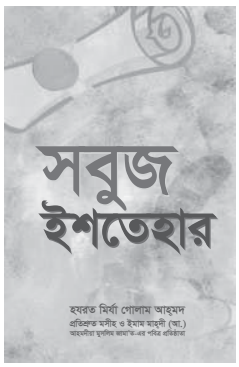

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) 'সবুজ ইশতেহার' নামে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছিলেন তা বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **আহমদ তারেক মুবাশ্বের**

বইটির মূল্য ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র।

বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি

জাফর আহমদ

(৩য় কিস্তি)

পৃথিবীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য দু'ধরনের উপজীব্য রয়েছে, প্রথমটি দৈহিক, দ্বিতীয়টি চিন্তা বা মননশীলতায় পুষ্ট মানসিক বৈচিত্র্য। দৈহিক প্রয়োজন বা পরিচর্যার মৌলিক উপকরণ হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও সুপেয়-পানি এবং এসবের মাঝেই মানুষের জীবনধারা প্রবাহিত। পাশাপাশি চিন্তা বা মননশীলতা ক্রমান্বয়ে মানুষকে দিয়েছে সভ্যতা, সুন্দর জীবনাচার, জীবন দর্শন ও উত্তরোত্তর প্রগতির মহিমা। পাশাপাশি মানুষের এই চিন্তা বা স্বাপ্নিক জগতের সকল অর্জন যে সম্পূর্ণ নির্দোষ, ন্যায্য, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ বলে সাব্যস্ত, আধুনিক বিশ্ব সে কথাটি জোর গলায় বলতে সক্ষম নয়। সভ্য জগতের মানুষ ইতোমধ্যে দু'টি মহা যুদ্ধের তান্ডবে বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু তাতেও এই সভ্য জগতের মানুষের শিক্ষা হয়নি, এখন আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ তাদের দরজায় কড়া নাড়ছে এবং দুর্ভাগ্যবশত তা যদি ঘটে বসে, তবে মানবজাতির হাজার হাজার বছরের অর্জন কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়বে, কেউ তা জানে না। হায়! চিন্তার উৎকর্ষতাই কি মানবাজতির দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো? কেউ কেউ সেই ভয়ঙ্কর দু:স্বপ্নে আঁৎকে উঠে বলেছেন, আগুনের আঁচে তপ্ত ভূপৃষ্ঠ যখন আস্তে আস্তে শীতল হয়ে যাবে, তখন যুদ্ধংদেহী মানুষেরা যুদ্ধ করবে লাঠি-সোটা দিয়ে।

অতএব কি সাব্যস্ত হয়? মানবজাতি কিভাবে তার এই চেতনানাশক কর্মতৎপরতার যৌক্তিক প্রতিবাদ করবে! কার্যত এটাই স্পষ্ট যে, মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার পরম উৎকর্ষতার পরও সেই জগতে এমন এক শূন্যতা বিরাজমান, যা সে কোনভাবেই নিজ ইচ্ছা বা কর্মের পরম পরাকাষ্ঠার মাধ্যমেও পূরণ করতে সক্ষম নয়। তাহলে আর কোন উপায় কি উদ্ভাবন করা যেতে পারে, যা এ শূন্যতা পূরণ করতে সক্ষম? সত্য এটাই যে, এ পর্যায়ে মানুষের কোন উদ্ভাবন নয়, বরং ঐশীবাণী বা ঐশীগ্রন্থ অবতরণই (নাজিল) মানুষকে দিতে পারে শান্তি, স্বস্তি ও সৌন্দর্যের সুষমামন্ডিত এক জীবন ও সমাজ তথা নিরাপদ ও সুস্থ এক পৃথিবী। প্রাচীনকাল থেকেই জগতে মুণি-ঋষিরা এসেছেন, তাঁরা বলে গেছেন, আরো আসবেন, আরো আরো অবতীর্ণ হবে এবং হয়েছে। অবতরণ করেছেন অবতার, অবতীর্ণ হয়েছে তৌরাত, ইঞ্জিল, যবুর। তবে সেসব কার পক্ষ থেকে? বেদ, উপনিষদই বা কি ছিল। সবশেষে তাঁরই পক্ষ থেকে অবতরণ (নাজিল) করা হয়েছে কুরআন, যিনি এই মহাবিশ্বের প্রভু-প্রতিপালক। চিন্তা ও শক্তির দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব, এই কুরআনের দ্বারাই তা সম্ভব। কেননা এই কুরআন নাযিল করেছেন সেই অপার্থিব সত্তা যিনি পার্থিব সকল উপকরণের স্রষ্টা। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন এমন এক মহান রাসূল, যিনি পৃথবীর সকল মুণি-ঋষি, জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক নবী-রাসূল নির্বিশেষে সকল মানুষের সেরা, অথচ বিস্ময়করভাবে তিনি ছিলেন নিরক্ষর। এ আশ্চর্য বাস্তবতার সকল রহস্য স্বয়ং আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে, যিনি নিজ অসহায় বান্দার পরিত্রাণের জন্য কুরআন নামক শুদ্ধতা ও মুক্তির সনদ অবতীর্ণ করেছেন।

মানবজাতির জন্য তার স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এর চাইতে বড় আর কি অনুগ্রহ হতে পারে যার মাধ্যমে তিনি মানুষের পরিত্রাণের পাথেয় দিয়েছেন? এই নিরিখে আল্লাহ্ তা'লার বাণী স্মর্তব্য :

২। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, (সবই) আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি অধিপতি, অতি পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।

৩। "তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে তাদেরই একজনকে এক মহান রাসূল করে আবির্ভূত করেছেন। সে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শোনায়, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শেখায়। অথচ এর পূর্বে নি:সন্দেহে তারা সুস্পষ্ট বিপথগামীতায় ছিল।।

৪। আর তাদেরই মধ্য থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।

৫। এ হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান, দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। (সূরা আল জুমুআ : ২-৫)

সুতরাং মানবজাতির জন্য অনাবিল শান্তি, সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও নির্বাণ লাভের পাথেয় তাদের হাতে রয়েছে, অথচ তারা বিভ্রান্তি ও বক্রতার মায়াজালে ঘুরপাক খাচ্ছে। চৌদ্দশ' বছর আগে তাদের সামনে পরিপূর্ণ জীবনবিধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ অবতারের দিকনির্দেশনা আসার পরও মানবজাতির বৃহত্তর অংশ তা অনুসরণ করেনি এবং কোন শিক্ষাও গ্রহণ করেনি। অথচ তা ছিল মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ তা'লার এক সীমাহীন অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন

ফাবে আইয়্যে আ'লায়ে রাব্বেকুমাতুকাজ্জেবা'ন– "অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (সূরা রহমান : ১৯)

অথচ তারা অস্বীকার করেই চলেছে। কাজেই

এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে তারা কিভাবে নিস্তার পেতে পারে? অজ্ঞতাবশত কেউ যদি বিষ পান করে, তবে তার দেহ বিষক্রিয়া থেকে কি মুক্ত থাকতে পারে?

সূরা জুমুআর ৫ম আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এক আধ্যাত্মিক অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন : "এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ'। যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে, ঈমান রাখে, তারা আল্লাহ্‌র এ অনুগ্রহকে অস্বীকারা করতে পারে না। তথাপি মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ কার্যত আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহকে অস্বীকার করে চলেছে, অথচ তারা তা উপলব্ধি করছে না বা করতেও চায় না। তাদের ক্ষেত্রেও কি অজ্ঞতাবশত বিষপানের সেই উদাহরণ প্রযোজ্য হবে না? আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাসীরা কেন তবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করতে আগ্রহী? তবে কি তারাও 'বধির, বোবা এবং অন্ধ'? তবে কি আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন? যদি তাই হয়, তবে তো তারা সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন করার নয়।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সহানুভূতি, দয়া ও অনুগ্রহের কোন সীমা নেই। তাই বাহ্যত যারা আল্লাহ্, রাসূল ও কুরআনের শিক্ষায় ঈমান রাখে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধ্বংস করেন না, বরং তাদের সংশোধনের আকাঙ্খাই প্রত্যাশিত। আল্লাহ্ তা'লার অসীম করুণা ও অনুগ্রহের ফলে তাই হোক, সেটাই আমাদের পরম প্রত্যাশা। সুতরাং যে অনুগ্রহের কথা আল্লাহ্ তা'লা সরাসরি প্রকাশ করেছেন, তা এক কথায় উড়িয়ে না দিয়ে পুন:পাঠ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে তো তাঁরা দেখতে পারেন। অন্তত তাতে তো কোন পাপ হবে না–তাঁরা গ্রহণ করুন বা না করুন। আমরা বিনীতভাবে তাঁদের কাছে আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহের তাৎপর্য যাচাই করার অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

সেই অনুগ্রহ হল এই : "আর তাদেরই মধ্য থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন) যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনি মহা পরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়।" (সূরা জুমুআ : ৪)

এ আয়াতের তাৎপর্য অনুধাবন করা আবশ্যক। এর তাৎপর্য হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আনীত ধর্ম আরব-অনারব নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই আল্লাহ্‌র একমাত্র মনোনীত ধর্ম। আর এ ধর্ম শুধু মহানবী (সা.) এর সমসাময়িক বিশ্ববাসীর জন্যও নয়, বরং সর্বকালের সকল মানুষের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত এটাই চূড়ান্ত ধর্ম হিসেবে বিরাজ করবে। আর মহানবী (সা.) অন্য আরেক দলের লোকের মাঝে আবির্ভূত হবেন, যারা তাঁর সমসাময়িক অনুসারীদের অর্থাৎ তাঁর সাহাবীদের সাথে মিলিত হয় নি।

এ আয়াতে শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ রূপে মহানবী (সা.) এর দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক আবির্ভাব ঘটবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। মহানবী (সা.) স্বয়ং এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। উল্লেখিত আয়াতে 'আখেরীন' অর্থাৎ অন্যদের কথা বলা হয়েছে। এতে সেই রাসূলের আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে, যাঁর সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে উল্লেখ রয়েছে– 'হুয়াল্লাযী বা'সা ফিল উম্মীঈনা রাসূলান'। কিন্তু এ আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'লার সেই ৪টি গুণের বর্ণনা দেয়া হয়নি, যা আয়াতের শেষে বর্ণিত হয়েছে। কেবল 'আযীয' ও 'হাকীম' নাম দু'টির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, শুরুতে যে রাসূলের কথা বলা হয়েছে, তিনি নিজে দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হবেন না, বরং তাঁর কোন যিল্লি (প্রতিচ্ছায়াকে) আবির্ভূত করা হবে, যিনি শরীয়তবাহী নবী হবেন না। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হল, হযরত ঈসা (আ.) প্রসঙ্গেও আল্লাহ্ তা'লার এ দু'টি গুণ অর্থাৎ 'আযীয' ও 'হাকীম'এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে : "বার রাফা আল্লাহু ইলায়হে ওয়া কানাল্লাহু আযীযান হাকীমা" (সূরা আন নিসা : ১৫৯)। (সূত্র : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে রাহে. কর্তৃক কুরআন করীমের প্রদত্ত টীকা)

এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন যে, যখন তাঁরা কয়েকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হলো। হযরত সালমান ফারসী (রা.)ও তখন তাঁদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন সাহাবারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে জানতে চাইলেন, এ সূরাতে উল্লেখিত "তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা তাদের সাথে এখনো মিলিত হয়নি– সেই অন্যরা কারা, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (মানহুম ইয়া রাসূলুল্লাহ্)? তাঁরা একথা জিজ্ঞেস করেননি, তিনি কে, যিনি আবির্ভূত হবেন? বরং তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি কাদের প্রতি আবির্ভূত হবেন। এর উত্তরে মহানবী (সা.) হযরত সালমান ফারসী (রা.) এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও চলে যায়, তথাপি এদের (পারস্য বংশীয়দের) এক বা একাধিক ব্যক্তি তা সুরাইয়া থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।"
(বুখারী, কিতাবুত তফসীর)

প্রকাশিত হয়েছে

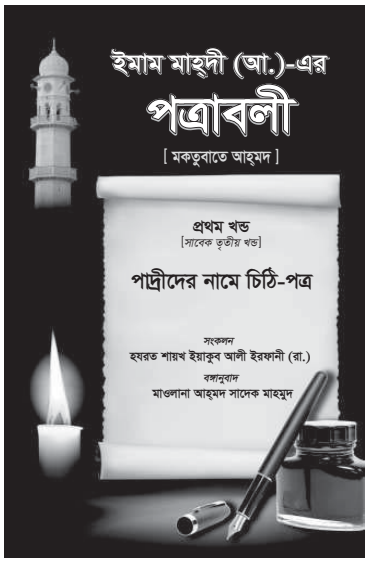

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

এ হাদীস থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে পুনরায় আবির্ভূত হবেন না, বরং তাঁর এক দাস আবির্ভূত হবেন এবং তিনি পারস্য বংশীয় এক মহাপুরুষ হবেন, আর নি:সন্দেহে তিনি অনারবদের মধ্য থেকে হবেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ পারস্য বংশীয় ছিলেন। সুতরাং কুরআনের আয়াত এবং হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহের সত্তার মধ্যেই মহানবী (সা.) এর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে।

৫ম আয়াত : "এ হল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর প্রথম আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত নয়। নতুন বা "ইউতিহি মাঁইয়াশাওঁ (তিনি যাকে চান দান করেন) বলার প্রয়োজন হতো না; বরং এ দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দ্বিতীয় আগমন বোঝানো হয়েছে। সেই আগমনকারী তাঁর (সা.) দাসত্বে এক উম্মতি নবীরূপে আবির্ভূত হবেন। আর এ হলো এক অনুগ্রহ, যা আল্লাহ্ যাকে চান তাকে দান করেন। তিনি মহা অনুগ্রহ ও কৃপার অধিকারী।

সূরা জুমুআর আয়াতগুলোর ইঙ্গিত বা ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মহানবী (সা.) এর দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে আরেকটি অনিন্দ্যসুন্দর বিষয় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় আগমন ঘটেছে তাঁরই দাস প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে। মহানবী (সা.) বাহ্যত উম্মী অর্থাৎ নিরক্ষর ছিলেন। আমরা এ উম্মী নবীকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, শ্রেষ্ঠতম মানব ও এক মহাসম্মানিত সৃষ্টি বলে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। কিন্তু দুনিয়ার প্রতি মোহাবিষ্ট মানুষ, যারা তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা যাতে তাঁকে 'উম্মী' বলে ভুল করতে না পারে, সেজন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রজ্ঞা ও হেকমত বিস্ময়করভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শেষ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দ্বিতীয় আগমন কার্যকারিতা লাভ করেছে এবং এই প্রতিশ্রুত মসীহকে আল্লাহ্ তা'লা 'সুলতানুল কলম' আখ্যায়িত করে এমন লেখনিশক্তি প্রদান করেছেন, যার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সকল ওজর-আপত্তি এত সহজভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যেমন সহজভাবে লবণ পানিতে বিগলিত হয়ে যায়। অথচ এই প্রতিশ্রুতি মসীহ্ আমাদের মহান রাসূল (সা.) এর অনুগত এক দাসানুদাস মাত্র। এমন দাসানুদাসের অসাধারণ লেখনীর মাধ্যমে যখন তাঁর প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, তখন সেই উম্মী নবীর জ্যোতির্ময় মুকুট এমন এক উচ্চতায় উপনীত হয় যে, দুনিয়ার আর কোন মানুষের পক্ষে সেই উচ্চতার ধারে কাছেও পৌঁছানো সম্ভব হয় না।

মহানবী (সা.)-এর সেই দাসানুদাস তাঁর সম্পর্কে বলেন :

"তিনি এমন লাইলাতুল কদর (ফয়সালার রাত্রি)
যা আমাদের চিরস্থায়ী নেয়ামতসমূহ দান করে"।
(কারমাতুস সাদেকীন)
অথবা
"বরতর গুমান ও ওহম স্যে আহমদ (সা.) কি শান হ্যায়
যিসকা গোলাম দেখো মসীহুজ্জামান হ্যায়।"
অর্থাৎ- আহমদ (সা.) এর মহিমা চিন্তা ও কল্পনারও উর্ধে
তাঁর গোলামকেই দেখো, সে যামানার মসীহ্ হয়েছে।

এই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র মাধ্যমে এ যুগে মহানবী (সা.) এর আহমদ নামের তাৎপর্য ও গুণাবলী বিকশিত হয়ে চলেছে। তাই শেষ যুগের মানুষের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমন সত্যিই আল্লাহ্ তা'লার আরেকটি বিশেষ অনুগ্রহ। আর এই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর বিস্ময়কর লেখনী শক্তির পরিচিতি প্রদান করা পৃথক আলোচনার বিষয়। এখানে শুধু তাঁর প্রতি খোদা তা'লার বিপুল অনুগ্রহের ক্ষুদ্র একটি অনুচ্ছেদ তাঁর বর্ণনা মোতাবেক উল্লেখ করছি :

"সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তিনি আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিয়েছেন, আমাকে গ্রহণ করেছেন, আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে লালন-পালন করেছেন, আর আমাকে নিজের পক্ষ থেকে সুস্থ বুদ্ধি ও সঠিক চিন্তাধারা দান করেছেন। অনেক জ্যোতি আমার হৃদয়ে সঞ্চার করা হয়েছে, যার কল্যাণে কুরআনের সেই জ্ঞান আমি লাভ করেছি যা অন্যরা জানে না। আর তাঁর পক্ষ থেকে আমি যা পেয়েছি, তা আমার বিরোধীরা বুঝতেও পারে না। আর এর ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে আমি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, অধিকাংশ মানুষের চিন্তা-ভাবনাই যেখানে পৌঁছুতে পারে না। এটি নিছক তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ এবং তিনি শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী।"

(হামামাতুল বুশরা : বঙ্গানুবাদ, পৃ: ১৩০)

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শিক্ষা"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ জানুয়ারী, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফার অবদান

২। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

স্বাধীনতা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নিয়ামত

মাহমুদ আহমদ সুমন

স্বাধীনতা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রের জন্য এক বিশেষ নিয়ামত। স্বাধীনতার ইসলামী স্বরূপ হচ্ছে-মানুষ মানুষের গোলামি করবে না। মানুষ একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তার গোলামি করবে। আরবিতে স্বাধীনতাকে 'ইসতিকলাল' বলা হয়।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাকে স্বাধীন করার জন্য ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক কিছু, দিতে হয়েছে লাখ প্রাণের তাজা রক্ত। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বন্যায় এবং ২ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত আব্রুর বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীন এই বাংলাদেশ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যা, ধ্বংস ও পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে ৯ মাসের মরণপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের, জন্ম হয় লাল-সবুজ পতাকার।

পাকিস্তানি শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির দিন, গৌরব ও অহংকারের দিন ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার হত্যা, ধ্বংস ও পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে ৯ মাসের মরণপণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের, জন্ম হয় লাল-সবুজ পতাকার।

একটি জাতির স্বাধীনতার ইতিহাস যেমন গৌরবের, তেমনি বেদনার। অনেক রক্ত, অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের বিজয়। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ও পটভূমি। একদিনের ঘোষণায় বা কারও বাঁশির শব্দ শুনে গোটা জাতি জীবন বাজি রেখে মরণপণ লড়াই-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। '৪৭-এ অদ্ভুত দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভক্তির পর থেকেই উর্দু-শাসকদের নানা কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বাঙালির রক্তে সংগ্রামের চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে।

মাতৃভাষার দাবিতে সেই '৪৮ সাল থেকে শুরু করে বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তদান, সংগ্রাম-আন্দোলন। '৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জাতির রায়, '৫৬-তে এসে সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বীকৃতি আদায়, '৬২-এর শিক্ষা কমিশন আন্দোলন, '৬৬-এর ৬ দফার মধ্য দিয়ে বাঙালির মুক্তিসনদ ঘোষণা, '৬৯-এর ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের বিদায় এবং '৭০-এ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরংকুশ বিজয়ের ধারাবাহিকতায়ই এসেছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বপ্নের স্বাধীনতা।

'৭০-এর নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয়ের পর বাঙালির স্বপ্নপুরুষ, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়েই আইনগত ও সাংবিধানিকভাবে অর্জন করেন দেশ পরিচালনার ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করার যোগ্যতা।

৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– এই জগদ্বিখ্যাত ঘোষণার মধ্য দিয়েই মূলত বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে যায়। খুঁজে পায় গেরিলাযুদ্ধের গোপন কৌশল ও দিকনির্দেশনা। তার পরও ২৫ মার্চ মধ্যরাতে গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধুর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর জাতিকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সমগ্র জাতি দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে 'জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান বুকে ধারণ করে এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থাপনের মধ্য দিয়ে মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিপাগল বাঙালির রক্তের বন্যায় ভেসে যায় পাকিস্তানের দম্ভ, প্রশিক্ষিত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দু'লক্ষাধিক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ, জ্বালাও-পোড়াও অভিযান 'অপারেশন সার্চলাইট'। প্রায় এক কোটি মানুষের ভারতে আশ্রয় গ্রহণ এবং মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান, রাশিয়ার অস্ত্র সরবরাহ ও কূটনৈতিক সমর্থন এবং ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সহযোগিতায় মাত্র ৯ মাসের যুদ্ধেই পৃথিবীর মানচিত্রে আর একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের জন্ম হয়– সেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

জন্মভূমির স্বাধীনতা একজন প্রকৃত মুসলমানের অস্তিত্বের অপর নাম। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ভোগ করা মৌলিক মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারা আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় নেয়ামত।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করে, তাদেরকে মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়, সম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

বিজয়ের এ মাসে জাতি নানান উৎসবের পাশাপাশি গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় স্মরণ করবে মহান মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদদের। স্মরণ করবে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী তাঁর সহকর্মী জাতীয় নেতাদের। জাতি শ্রদ্ধা জানাবে বীরাঙ্গনা আর শহীদমাতাদের।

আল্লাহ্ পাকের জমিনে তিনি পরাধীনতা পছন্দ করেন না। যেখানে স্বাধীন ভূখন্ড নেই সেখানে ধর্ম নেই আর যেখানে ধর্ম নেই সেখানে কিছুই নেই। তাই ইসলামে স্বাধীনতার গুরুত্ব অতি ব্যাপক। সৃষ্টির প্রতিটি জীব স্বাধীনতা পছন্দ করে। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি বা জীব পাওয়া যাবে না যারা পরাধীন থাকতে চায়। তাই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সবাই কতই না চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে। আর এই স্বাধীনতার জন্যই মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে মক্কাকে করেছিলেন স্বাধীন।

ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত নবীর আগমণ হয়েছে তারা সবাই সমাজ, দেশ ও জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন। আর এই স্বাধীনতা অত্যাচারী শাসকের দাসত্ব থেকে জাতিকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রেই হোক বা ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে হোক। এক কথায় বলা যায়, সব ধরণের দাসত্ব ও পরাধীনতা থেকে মুক্ত করাই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত নবীদের কাজ।

আমরা জানি, গোলাম মুক্ত করে এবং সর্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য যিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন এবং শতভাগ সফল হয়েছেন, তিনি হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি হচ্ছেন স্বাধীনতার উজ্জল সূর্য। যাঁর কিরণ দূর-দূরান্তে বিস্তার লাভ করেছে, যিনি নিজের মাঝে সব ধরণের স্বাধীনতাকে ধারণ করেছিলেন। যিনি মানুষকে শুধু বাহ্যিক দাসত্ব থেকেই স্বাধীনতা দেননি, বরং সমাজ ও দেশ থেকে সব ধরণের নৈরাজ্য দূর করে সবাইকে করেছিলেন স্বাধীন। বিশ্বের এক বিশাল জনগোষ্ঠী অবলোকন করেছে, কিভাবে বিশ্বনবী (সা.) সর্বত্র স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পরাধীনতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য তিনি যেমন লড়েছেন তেমনি তিনি সকলকে করেছিলেন স্বাধীন। কিন্তু এটি বড়ই পরিতাপের বিষয়, অনেক জাতি স্বাধীনতার প্রকৃত পতাকাবাহীদের অস্বীকার করে এবং সর্বোত্তম শাসকের (আল্লাহ্‌র) শাসনের ওপর জাগতিক শাসকের দাসত্বকে অগ্রাধিকার প্রদান করার ফলে তারা কেবল নিজেরাই প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়নি, বরং বহু জাতি আল্লাহ্‌র আজাবগ্রস্থ হয়ে ধ্বংসও হয়ে গেছে। একান্তই সত্য যে, বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাওয়ার কারণে স্বাধীনতা কেবল তাদের হাতছাড়া হয়নি বরং সে জাতির ইহ ও পরকাল উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেছে।

প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহপাক মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এটাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে বিবেক ও বিশ্বাসেরও স্বাধীনতা দিয়েছেন। কাউকে পরাধীন করেননি।

যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'তোমার প্রভু-প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসত। তবে কি তুমি মোমেন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর বল প্রয়োগ করবে?' (সূরা ইউনুস: ১০)। এই আয়াত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ্ সবার স্বাধীনতা চান। তিনি চাইলে সবাইকে একসাথে মোমেন বানাতে পারেন কিন্তু তা তিনি করেননি। তিনি চেয়েছেন মানুষ যেন স্বাধীনভাবে বুঝেশুনে ঈমান আনে।

জন্মভূমির স্বাধীনতা একজন প্রকৃত মুসলমানের অস্তিত্বের অপর নাম। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ভোগ করা মৌলিক মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারা আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় নেয়ামত।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করে, তাদেরকে মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়, সম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করে

দুনিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

হযরত রসূল করীম (সা.) অসংখ্য দাসকে নিজ খরচে মুক্ত করেছেন। মহানবী (সা.) বলতেন, যে কোন মুসলমান দাস মুক্ত করবে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দোযখ থেকে পূর্ণ মুক্তি দান করবেন।

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ব্যক্তিগত আদর্শ এটা ছিলো যে, যখন হযরত খাদিজা (রা.) বিবাহের পর তাঁর (রা.) সমস্ত কৃতদাস ও সম্পদ তাঁকে (সা.) দিয়ে দেন তখন তিনি (সা.) সবাইকে মুক্ত করে দেন। তাদের মধ্য থেকে যায়েদ বিন হারেশ নামে এক দাস ছিলো, যাকে তিনি (সা.) পালিত পুত্র বানিয়েছিলেন আর তার সাথে এমন স্নেহ এবং ভালোবাসার ব্যবহার করতেন যে, যখন তার প্রকৃত পিতা-মাতা তাকে নিয়ে যেতে আসলো, তখন হযরত যায়েদ (রা.) তাদের সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন।

হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি এক সুযোগেই বিশ হাজার কৃতদাসকে মুক্ত করে দেন। এ ধরণের উত্তম দৃষ্টান্ত ইসলামে ভরপুর। দাসমুক্তির সামাজিক নেককাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সাহাবায়ে কেরামকেও উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁরা মহানবী (সা.)-এর হুকুম অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছেন। এমনকি নিজের টাকার বিনিময়ে আজাদ করা দাসদেরকে পরমপ্রিয় বন্ধুও বানিয়েছেন।

স্বাধীনতাকে ইসলাম যেমন গুরুত্ব দিয়েছে তেমনি দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধকেও অতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে ঈমানের অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম যেমন ছিল, তেমনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের মাঝেও তা বিদ্যমান ছিল। তিনি (সা.) মক্কা থেকে মদীনার পথে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাঁর মুখ ফেরালেন জন্মভূমি মক্কার দিকে, যেখানে তিনি নবুয়ত লাভ করেছেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষরা বসবাস করে আসছেন। তিনি বার বার ফিরে তাকাচ্ছেন মক্কার দিকে, চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। মক্কার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করলেন 'হে মক্কা! তুমি আমার কাছে সমস্ত স্থান থেকে অধিক প্রিয়, আমি মক্কাকেই ভালোবাসি। আমার মন মানছে না। কিন্তু তোমার লোকেরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না। হে খোদা! সব কিছুর মালিক তুমি। মক্কার মানুষদের ঈমানের আলোয় উজ্জল কর। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত কর' (মুসনাদ, আহমদ ও তিরমিযি)।

একটু ভেবে দেখুন! স্বদেশের প্রতি কতই না গভীর প্রেম ছিল তাঁর। যে দেশের লোকেরা তাঁর ওপর এতো জুলুম অত্যাচার করেছে, তার পরেও মাতৃভূমির প্রতি কত অগাধ ভালোবাসা। একেই না বলে স্বদেশপ্রেম।

হিজরতের পর মদিনায় হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত বেলাল (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় তাদের মনে-প্রাণে স্বদেশ ভূমি মক্কার স্মৃতিচিহ্ন জেগে উঠেছিল। তারা জন্মভূমি মক্কার দৃশ্যাবলী স্মরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন। এ অবস্থায় নবী করীম (সা.) সাহাবীদের মনের এ দুরবস্থা দেখে প্রাণভরে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ্! আমরা মক্কাকে যেমন ভালোবাসি, তেমনি তার চেয়েও বেশি মদিনার প্রতি ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দান করুন' (বুখারী)।

দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌম রক্ষায় হযরত রাসূল করীম (সা.) যখনই আহ্বান করেছেন তখনই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সর্বোতভাবে এ ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তারা জানতেন, নিজেদের বিশ্বাস, আদর্শ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি স্বাধীন ভূখন্ডের প্রয়োজন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তারা যেমন আন্তরিক ছিলেন, তেমনি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষায়।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করে, তাদেরকে মানুষ হিসেবে নিজের পরিচয়, সম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

তিনি (সা.) যেমন অসংখ্য দাসকে নিজ খরচে মুক্ত করেছেন, তেমনি সমগ্র বিশ্বকে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রকৃত-স্বাদ। আজ থেকে ৪৩ বছর পূর্বে আমরা এদেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি এ স্বাধীনতার স্বাদ যেন আমরা উপভোগ করতে পারি। আল্লাহ্ পাকের কাছে এ কামনা করি, আমাদেরকে যেন পুণরায় দাসত্বের জীবনে জড়িয়ে পড়তে না হয়। নিজ দেশের প্রতি, দেশের সম্পদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে।

আমরা যদি ঈমান দারির সাথে এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে নিজেদের স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করি, তাহলে এটি অসম্ভব নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীকে আমরা ইনশাআল্লাহ্ পথনির্দেশনা দিব।

masumon83@yahoo.com

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ
১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আমাদের কোর্স সমূহঃ
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০.০০ টাকা, কোর্স ফি -৫০০.০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০.০০ টাকা। সর্বমোট ৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ
সৈয়দ খালেদ হাসান
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৫৫৮৩১৯৬২৬, ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং কিছু কথা

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(২য় ও শেষ কিস্তি)

শারিরীক ভাবে তাঁর দিকে উচ্চারোহন কোন মতেও সম্ভব নয়। এই শব্দটি মর্যাদা-বৃদ্ধি অর্থে কুরআনের ২৪:৩৭, ৩৫:১১ আয়াত দ্বয়েও ব্যবহৃত হয়েছে। ঈসা (আ.) এর মর্যাদার উচ্চারোহন এই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা মিথ্যা দাবী করেছিল, তাহারা ঈসাকে ক্রুশে মেরে অভিশপ্ত প্রমাণ করেছে, কুরআন বলে, আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ.) ক্ষণিকের জন্যও অভিশপ্ত হতে পারে না, বরং মর্যাদায় উচ্চ হতে আরো উচ্চে উন্নীত হন। 'মুতাওয়াফ্‌ফিকা' ও 'রাফিউকা' শব্দ দু'টির ব্যাখ্যা বুঝলেই ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি দূর হবে। বেশ কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত মাসিক বিনোদন পত্রিকাতে ড. হাসনাইন যিশু সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন। যেখানে তিনি বলেছেন 'যিশু ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে মারা যাননি, যিশুর কবর কাশ্মীরে।

ঐ পত্রিকার ১২ ও ১৩ পাতার কিছু উদ্ধৃতি পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে বর্ণনা করছি। ড. হাসনাইন বলেন, যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত কাশ্মীর-এর পবিত্র স্মৃতিসৌধে পরিচয় চিহ্নিত না থাকলেও ভেতরে অনেক অবশিষ্ট ধুলিকণা চোখে পড়ে। ঐ মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ ঘটে অন্তত ১৮০০ বছর পূর্বে। তাঁর নাম যুশ আসফ বলে জানা যায়। অবশ্য অনেকের কাছে এসবের কোন অর্থ নেই। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা এখানে প্রতিবছর প্রার্থনা করতে এসে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস, এই কবর আর কারো নয় স্বয়ং যীশু খ্রিষ্টের। তাদের বহু শতাব্দী পোষিত ধারণা যে, জেরুযালেম থেকে অতি দূরে গোনগোটা পাহাড়ে যে ব্যক্তি ক্রুশবিদ্ধ হন, তিনি ও যুস আসফ অভিন্ন ব্যক্তি। তাকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে চিকিৎসা করা হয় এবং নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা হয়। তার অনুসারী ভক্তবৃন্দ এটা করে। তিনি দ্বিতীয় বারের জন্য ভারতে আসেন তাঁর মতাদর্শ প্রচারের জন্য এবং এখানেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। অধ্যাপক বলেন, জীবিত যিশুকেই ক্রুশ থেকে নামানো হয়। পরে সেবা-শুশ্রূসা করে আরোগ্য করা হয়। "পরে তিনি পালিয়ে পারশ্য ও আফগানিস্তান হয়ে কাশ্মীরে চলে এসেছিলেন, যেখানে ইতিপূর্বে বহু পলাতক ইহুদী আশ্রয় নেয়।

বেশ কবছর তিনি এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং নিম্নরূপ তথ্য ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন : সাধারণত: ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যেতে তিন-চার দিন সময় লাগে, ক্লান্তি, ক্ষুধা, ও তৃষ্ণা এই মৃত্যুর কারণ হয়। "যিশুকে এক শুক্রবার দুপুরে ক্রুশে লাগানো হয়, নয় ঘন্টা পর তার চৈতন্য-বিলুপ্তি ঘটে। সময়টা সাবাথ দিবসের সন্নিকট হয়ে পড়ে, আর ইহুদীরা কাউকে সাবাথ দিবসে ক্রুশবিদ্ধ করে না। জনৈক রোমান সৈন্য যীশুর পৃষ্ঠদেশে একটা বর্শা বিদ্ধ করে, তাতে প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হয়। তাকে ক্রুশ থেকে নামানো হয়।" যোসেফ ও নিকোডেমাসকে অনুমতি দেয়া হয় যিশুকে মুরিয়ে নেয়ার জন্য। তাঁকে দ্রুত সরিয়ে নেয়া হয়। অত:পর তাঁকে শুইয়ে দিয়ে সারা শরীরে তেল ও ক্রীম মাখানো হয়। পরে দ্রুত তার দেহ বস্ত্রাবৃত করা হয়।

ইহুদীগণের দাবী, তারা ঈসা (আ.)-কে হত্যা করেছে :-

আল্লাহ্ তা'লা উক্ত দাবী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যে তথ্য প্রদান করেছেন, তা এখন আমি উল্লেখ করছি। সূরা নিসার ১৫৮ ও ১৫৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, অর্থাৎ এবং তাদের এই বক্তব্যের কারণে 'আমরা আল্লাহ্‌র রসূল মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্‌কে নিশ্চয় হত্যা করেছি অথচ না তারা তাকে হত্যা করেছিল এবং না তারা তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে নিহত করেছিল। বরং তাদের নিকটে তাহাকে (ক্রুশবিদ্ধ মৃতের) অনুরূপ করা হয়েছিল এবং নিশ্চয় তারা যারা তার ব্যাপারে মতভেদ করে তারা ঘোর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত, তাহাদের এই বিষয়ে কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান নাই, কেবল অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত এবং নিশ্চিতরূপে তারা তাকে হত্যা করে নাই। ইহুদী কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.)কে ক্রুশে দেয়ার ব্যাপারে এ আয়াতে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত অনেক তফসীর বাজারে পাওয়া যায়, যাতে কিচ্ছা কাহিনীতে ভর্তি এমন কিছু কিছু তফসীর আছে যেগুলোকে আমরা তবলীগের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি। ইহুদীদের দাবীর প্রেক্ষিতে এ আয়াতে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, তা পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি।

'মা-সালাবুহু' অর্থ তারা ক্রুশে দিয়েও তাকে নিহত করতে পারেনি। 'সালাব' অর্থই হল এক ধরনের হত্যা পদ্ধতি। 'সালাবাল লিম্বা' অর্থ তারা ক্রুশে দিয়ে চোরটাকে হত্যা করল। এ আয়াত ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে চড়াইবার কথা স্বীকার করে কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে স্বীকার করে না।

'শুব্বিহা লাহুম' অর্থ ইহুদীদের কাছে ঈসা (আ.)কে ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় বা ক্রুশ হতে নামানোর পর মৃত দেখাচ্ছিল। অন্য অর্থ ঈসার (আ.) মৃত্যুর ব্যাপারটা ইহুদীদের কাছে সন্দেহ যুক্ত ও ঘোলাটে হয়েছিল। 'শুব্বিহা-আলায়হিল আমরু' অর্থ বিষয়টা তার নিকট অস্পষ্ট ঘোলাটে বা সন্দেহযুক্ত করা হয়েছিল (লেইন)।

"মা কাতালুহু একীনান" বাক্যটির অর্থ: (১) তারা নিশ্চয় তাকে হত্যা করতে পারেনি, (২) তারা তার (ঈসা আ. এর) মৃত্যুর অনুমানকে নিশ্চয়তার পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে নি। অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর ক্রুশে মৃত্যু সম্বন্ধীয় তাদের ধারণা সংশয়াতীত হয়ে তাদের মনে নিশ্চয়তার সৃষ্টি করেনি। এই ক্ষেত্রে 'কাতালুহু'র 'হু' 'যান্নহু' (অনুমান) শব্দের সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে করতে হবে ঈসা (আ.) ক্রুশে মৃত্যুবরণ না করে পরে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তা কুরআন হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, বরং আল্লাহ্ তাঁকে তার দিকে উন্নীত করেছেন। বস্তুত: আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। এ আয়াতে আল্লাহ্‌র দিকে উন্নীত বলতে নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গাকে বুঝায়। অথচ আল্লাহ্‌র বিশেষ কোন দিক নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি নিকটে থেকেও দূরে এবং দূরে থেকেও নিকটে। প্রত্যেক মু'মিনের হৃদয়ে তাঁর আরশ। স্বশরীরে যদি ঈসা (আ.)কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে তো আল্লাহ্ যেদিকে যান, ঈসাও সেদিকে যান, বিষয়টি তেমন মনে হয় না কি? কি ধরনের অবাস্তব বিশ্বাস মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করেছে।

ইহুদীরা উল্লাসের সাথে দাবী করে, তারা ঈসা (আ.)কে ক্রুশে নিহত করে প্রমাণ করেছে যে, তিনি নবী ছিলেন না, বরং মিথ্যা দাবীকারক ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াত ও আলোচ্য আয়াত মিলিয়ে ইহুদীদের এই মিথ্যা অপবাদকে খন্ডন করেছে এবং তাদের আরোপিত সর্বপ্রকার দোষত্রুটি হতে তাকে মুক্ত ঘোষণা করছে। আরও ঘোষণা করছে যে, ঈসা (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নিকট আধ্যাত্মিক-মর্যাদার উচ্চস্তরে সম্মানীত আসনে সমাসীন আছেন। এই আয়াতের কোথায়ও ঈসা (আ.)-এর স্বশরীরে আকাশে উঠার কোন কথা নাই। আয়াতে করীমা শুধু এই কথাই বলছে, আল্লাহ্ তাকে নিজের সান্নিধানে সম্মানিত করেছেন অর্থাৎ- আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আল্লাহ্‌র কাছে উঠাবার অর্থ কোনও নির্দিষ্ট জাগতিক স্থানে নিয়ে যাওয়া বুঝাতে পারে না, কেননা আল্লাহ্‌র জন্য কোন বাসস্থান নির্ধারণ করা যায় না। সূরা মারইয়ামের ৫৭ ও ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে, এবং এই কিতাবে (যেরূপ বর্ণিত হয়েছে) তুমি ইদ্রিসের (বৃত্তান্ত) উল্লেখ কর, নিশ্চয় সে পরম সত্যবাদী নবী ছিল। এবং আমরা তাকে অতি উচ্চ মর্যাদায় উন্নত করেছিলাম। পবিত্র কুরআনে 'রাফা' শব্দ উচ্চ মর্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরও অনেক স্থানে এই শব্দটির উল্লেখ রয়েছে যা উচ্চ মর্যাদা অর্থেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী নবীরাও মারা গিয়েছেন :

মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন মজীদে অযৌক্তিক কোন কিছুই বর্ণনা করেননি। প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.)-কে নিয়ে এই উম্মতের মাঝে যে ভুল ভ্রান্তি রয়েছে তা পবিত্র কুরআনের আলোকে দূরীভূত করা সম্ভব। সূরা আল মায়েদার ৭৬নং আয়াতে বলা হয়েছে, মরীয়মের পুত্র মসীহ ছিল কেবল এক রাসূল, তার পূর্বে সকল রাসূল মারা গিয়েছে। এবং তার মাতা একজন সত্যবাদিনী ছিল। তারা উভয়েই খাদ্য খেত। দেখ! আমরা কিরূপে তাদের (কল্যাণের) জন্য নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি; পুনরায় দেখ! কিরূপে তাদেরকে সত্য হতে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই আয়াত দ্বারা ঈসা (আ.)-এর পূর্ববর্তী নবীদের মৃত্যুর বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। আর সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ নং আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) সহ সকল নবীর মৃত্যুর কথা প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া হযরত ঈসা (আ.)-এর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস এক অলীক ধারণা। এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অত্র আয়াতে কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে (ক) ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র অন্যান্য রাসূল হতে কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন না, (খ) তিনি মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন (গ) অন্যান্য সব মানুষের মত তিনিও প্রকৃতিক ক্ষুধা তৃষ্ণার নিয়মাধীন ছিলেন। প্রকৃতির যতসব নিয়ম-কানুন মানুষের জন্য প্রযোজ্য, তার সবকিছুই ঈসা (আ.) এর উপরও সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। ঈসা (আ.) এসবের একটিরও উর্ধ্বে ছিলেন না। তিনি এবং তার মাতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন খাদ্য খেতেন। এখন আর জীবিত নেই তাই খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও নেই। প্রত্যেক জীবের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যদি ঈসা (আ.) তথাকথিত আলেমদের কথা অনুযায়ী আকাশে জীবিত থাকেন আর কিয়ামতের পূর্বে আসবেন বলে ধারনা রয়েছে তাহলে এতো দীর্ঘ সময় ধরে তিনি সেখানে কি খাদ্য খাচ্ছেন বা কে খাদ্য আকাশে প্রেরণ করছেন, এমনকি প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তা কিভাবে সমাধান করছেন, প্রশ্ন থেকে যায়।

উল্লেখিত সূরার ১১৭ ও ১১৮ আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয়, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন না বা তিনি আকাশে জীবিতও নেই বরং তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। বলা হয়েছে, এবং যখন আল্লাহ্ বললেন, 'হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলেছিলে যে, আল্লাহ্‌কে ছেড়ে আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই মা'বুদরূপে গ্রহণ কর?' সে বলবে, তুমি পরম পবিত্র, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না যে, আমি এমন কিছু বলি, যা বলার অধিকার আমার নাই। যদি আমি তা বলে থাকতাম, তা হলে অবশ্য তুমি তা জানতে। যা আমার অন্তরে আছে তুমি জান, কিন্তু আমি তা জানিনা যা তোমার অন্তরে আছে। নিশ্চয় তুমিই অদৃশ্য বিষয়সমূহের সর্বজ্ঞাতা।

হযরত ঈসা (আ.) এর উত্তরে যা বলেছিলেন, পরের আয়াতে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আর তা হলো, "আমি তাদেরকে কিছু বলিনি কেবল তা ব্যতিরেকে যার আদেশ তুমি আমাকে দিয়েছিল যে, তোমরা ইবাদত কর আল্লাহ্‌র, যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভূ এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, তখন তুমিই তাদের ওপর তত্তাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের ওপর সাক্ষী।

এই আয়াতে ঈসা (আ.) একমাত্র আল্লাহরই উপসনা করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কেননা, একজন নবীর কাজই হলো তার জাতিকে সত্যিকার প্রভূর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা। একজন নবী হিসেবে ঈসা (আ.) কখনই একাধিক উপাস্যের শিক্ষা দিতে পারেন না। এছাড়া এ আয়াতটি ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টিও

স্পষ্ট করেছে। ঈসা (আ.) "যতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তিনি তার অনুসারীদের (বনী ইসরাঈল) প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখতেন, যাতে তারা সঠিক পথ হতে ছিটকে না পড়ে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তারা কোন্ পথ অবলম্বন করেছে এবং কোন্ কোন্ মিথ্যা বিশ্বাস গ্রহণ করেছে, তা তিনি জানতে পারেননি।

এখন যেহেতু তার অনুসারীরা বিপথগামী হয়েছে, তাতে এটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা, এ আয়াত এই কথাই বলে যে, ঈসা (আ.)-এর অনুসারীরা তার মৃত্যুর পরই তাকে খোদা বলে পূজা করবে। দ্বিতীয়তঃ এই আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈসা (আ.) এর কথা তাঁর মৃত্যুর পর তাকে এবং তার মাকে দুই খোদা বলে পূজা করার কথা তিনি মোটেই জ্ঞাত নহেন–প্রমাণ করে যে, তিনি আর কখনও এই পৃথিবীতে আগমন করবেন না। কেননা, যদি তিনি পৃথিবীতে পুনরাগমন করতেন এবং স্বচক্ষে দেখতেন যে, তার অনুসারীরা তাঁকে ও তার মাতাকে পূজা করছে, তা হলে তিনি এই বিষয়ে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতেন না। এইরূপ অজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ্‌র কাছে উত্তর দিলে, ইহাকে জ্বাজ্জল্যমান মিথ্যা বলে আল্লাহ্ তাকে তিরস্কার করতেন। নবী হয়ে আদৌ তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না।

অতএব, এই আয়াত অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলছে, ঈসা (আ.) মারা গেছেন এবং তিনি আর কখনও পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করবেন না। তদুপরি, নবী করীম (সা.)-এর একটি সুবিখ্যাত হাদীসে আছে নবী করীম (সা.) যখন তাঁর একদল সাহাবী বা অনুসারীকে কেয়ামতের দিন দোযখের দিকে নেওয়া হচ্ছে দেখবেন, তখন এই কথাগুলিই বলবেন, যা এই আয়াতে ঈসা (আ.)-এর মুখে উচ্চারিত হয়েছে। 'আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, তাদের তত্তাবধায়ক ছিলাম, কিন্তু যখন আমাকে মৃত্যু দিলে, তখন থেকে তুমিই তাদের তদারকি করেছ।' (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর, সূরা মায়েদা) এটিও আরেকটি অতিরিক্ত প্রমাণ যে, রাসূল পাক (সা.) এর মতই ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতের বরাতে এই বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষ হয়ে সে কিভাবে আকাশে যেতে পারে আবার সেখানে দীর্ঘ দিন অবস্থান করার পর কেয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে আগমন করা এটি একটি অবান্তর বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়। এ ধরনের ধারণা যাদের রয়েছে তারা এর থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। বিষয়টি গভীর ভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি। হযরত ঈসা (আ.)-এর বেঁচে থাকা ইসলামের জন্য হুমকী স্বরূপ আর নবী করীম (সা.)-এর শানের খেলাপ বৈ কি। উল্লেখিত আয়াত সমূহে 'মউত' বা অপর কোনও শব্দ ব্যবহার না করে আল্লাহ্ তা'লা যে ওফাত শব্দ ব্যবহার করেছেন, তার একটা গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে ।

'ওফাত' অর্থ স্বাভাবিক মৃত্যু। ইহুদীদের দাবী ছিল, তারা ঈসা (আ.)কে হত্যা করেছে। এবং তাদের কেতাব মোতাবেক তারা বিশ্বাস করে, যে ব্যক্তি নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার হয়, হয় সে কতল (নিহত) হয়ে যায়, নয়ত সে ক্রুশে মারা গিয়ে লানতী বা অভিশপ্ত হয়। এবং এরূপ ব্যক্তির আত্মা মৃত্যুর পরে আল্লাহ্‌র দিকে উন্নীত হয় না, উর্ধ্বগতি লাভ করে না, বরং অধোগতি প্রাপ্ত হয়, কাজেই ইহুদীদের দাবীর তাৎপর্য এটাই ছিল যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম যেহেতু নিহত হয়েছেন বা অভিশপ্ত মৃত্যু বরণ করেছেন, সেহেতু তাঁর আত্মা আল্লাহ্‌র দিকে উন্নীত হয়নি– 'রাফা' লাভ করেনি। ইহুদীদের এইসব দাবীকেই মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'লা এই কথা বলে : 'বার রাফাহুল্লাহু ইলাহি' 'বরং তাকে আল্লাহ্ তাঁর দিকে রাফা দিয়েছেন' (৪ : ১৫৯)।

এই কথার দ্বারা একদিকে প্রমাণিত হয়েছে, ঈসা (আ.) না নিহত হয়েছেন, না ক্রুশে মারা গেছেন, বরং তিনি স্বাভাবিক ভাবেই মারা গেছেন এবং তাঁর আত্মার 'রাফা' হয়েছে আল্লাহ্‌র দিকে। কেননা, মানুষের আত্মার রাফা হয় তার মৃত্যুর পরে। জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আসমানে চলে যাওয়া বা উঠিয়ে নেয়াকে 'রাফা' বলে না। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : "ইয়ারফা ইল্লাহুল্লাযিনা আমানু মিনকুম" অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আল্লাহ্ তাদেরকে 'রাফা' দান করেন (৫৮:১২)।

বলাই বাহুল্য, মু'মিনদের এই রাফা হয় তাদের আত্মার উর্ধ্ব গমনের মাধ্যমে, এবং মৃত্যুর পরেই। সে কারণেই ঈসা (আ.)-কে জীবিতাবস্থায় স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার কথা না আছে কুরআনে আর না আছে হাদীস শরীফে, এমন কি কোনও যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসেও নেই। অদ্যাবধি কেউই দেখাতে পারেন নি, পারবেনও না।

অতএব আল্লাহ্‌র ঐ কথার অর্থ এটাই যে, হে ঈসা, আমি তোমাকে স্বভাবিক মৃত্যু দিব- তুমি নিহত হবে না, অভিশপ্ত মৃত্যুও বরণ করবে না- এবং আমি তোমার আত্মাকে আমার দিকে উন্নীত করবো। এবং ঈসা (আ.) ও বলছেন, যখন তুমি আমাকে ওফাত (স্বাভাবিক মৃত্যু) দিলে, তার পরের খবরাখবর তুমিই জান। এরপরও কেউ যদি বলতেই থাকেন যে ঈসা (আ.) অদ্যাবধি দু'হাজার এর অধিক বছর ধরে আকাশে কোথাও বেঁচেই আছেন, তাহলে খোদার কালাম বিরোধী সেই কথাটা বলার দায়-দায়িত্ব তারই। মনে রাখা দরকার যে, ওফাত দেওয়ার কর্তা যখন আল্লাহ্ হন, তখন ওফাতের অর্থ 'জান কবয' করা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

মৃত ব্যক্তি আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে আসে নাঃ

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "তারা কি দেখেনি যে, তাদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা কখনও তাদের নিকটে ফিরে আসে না?" (৩৬ : ৩২)। পুনরায় উল্লেখ রয়েছে, এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিনে উত্থিত করা হবে" (২৩:১৬, ১৭)। এছাড়া আরও অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। (আরও দেখুন : ২১ : ১৬ ৩৬:৫১; ৬:২৮)। মহান আল্লাহ্ তা'লা পুনরায় বলেছেন, "এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রভূ! তুমি আমাকে ফেরৎ পাঠাও, যেন আমি সেই সমস্ত পুণ্য করতে পারি, যা আমি (পার্থিব জীবনে) ছেড়ে এসেছি। কখনো না, এ কেবল একটা মুখের কথা, যা সে বলছে, এবং তাদের পিছনে সেই দিন পর্যন্ত এক পর্দা রয়েছে যখন তারা পুনরুত্থিত হবে" (২৩ : ১০০-১০১)।

সুধী পাঠক! পবিত্র হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্য থেকে দু' তিনটি বর্ণনা নীচে তুলা ধরা হলো : ১। আকাবায় দ্বিতীয় দফায় বয়আতগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম সাহাবী

ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) শাহাদত লাভ করেন ওহোদ-এর যুদ্ধে। তাঁর শাহাদতের পর হযরত রাসূল করীম (সা.) তাঁর পুত্র জাবের (রা.)কে সান্তনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, তোমার পিতার সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা কথা বলেছিলেন। আল্লাহ্ খুশী হয়ে তাকে বলেছিলেন, 'হে আমার বান্দা! তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে চেয়ে নাও।' তখন তোমার পিতা বলেছিল, 'হে আমার স্রষ্টা! আমার প্রভু! আমার মাত্র একটাই আকাঙ্খা, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে যিন্দা করে পাঠানো হোক, যেন আবারও আমি আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হতে পারি।' উত্তরে আল্লাহ্ বলেছিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা করতাম। কিন্তু আমি এই ফয়সালা পূর্বেই করে রেখেছি, কোন মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সে আর কখনও দুনিয়াতে ফিরে আসবে না' (তিরমিযী, মিশকাত)।

২। একবার এক ব্যক্তি মারা গেলে সাহাবীদের (রা.) কেউ কেউ মহানবী (সা.) এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি দোয়া করুন, সে যেন জীবিত হয়ে ওঠে। 'উত্তরে' রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের সাথীর মাগফেরাতের জন্য দোয়া কর, এবং যাও তোমাদের সাথীকে দাফন কর'– (মুসলিম, মিশকাত)। এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী যাকে আমরা শেষ যুগের মহাপুরুষ হিসেবে মাণ্য করেছি তিনি (আ.) বলেছেন, "স্মরণ রাখিও কেউই আকাশ হতে অবতীর্ণ হবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী যারা আজ জীবিত আছে, তারা সকলে মরবে, কিন্তু তাদের মধ্য হতে কেউই মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.)কে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অত:পর তাদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তাদের মধ্য হতেও কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.)কে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অত:পর তাদের সন্তানদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ হতে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে এবং আজ হতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবে না যখন ঈসা (আ.)-এর অপেক্ষাকারীরা, কি মুসলমান, কি খ্রিষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে, ঐ মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা। আমি তার এক বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার দ্বারা এই বীজ বপন করা হয়েছে। এখন তা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ তাকে রুখতে পারবে না। ('তাযকেরাতুস শাহাদাতাইন' পুস্তক থেকে)।

পরিশেষে বলতে চাই, এটা সুস্পষ্ট সত্য যে, মানুষ মারা গেলে এই দুনিয়াতে আর ফিরে আসে না। তা সে সাধারণ কেউ হোক, আর আল্লাহ্‌র কোন নবীই হোন। কাজেই, যারা অজ্ঞতার কারণে কিংবা জিদের কারণেও এই কথাটা বলতে চান, হযরত ঈসা (আ.) মারা গেলেও আল্লাহ্ তাঁকে আবার জীবিত করে দুনিয়াতে পাঠাবেন, তারা আল্লাহ্‌র নিয়ম-এর বিরুদ্ধে কথা বলেন। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তো স্বয়ং এই অমোঘ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তিনি তাকে আর কখনই পৃথিবীর বুকে ফেরৎ পাঠাবেন না। এবং আল্লাহ্ তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টানও না, ভঙ্গও করেন না। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.) যখন মারাই গেছেন তখন এই পৃথিবীতে তার ফিরে আসার সুযোগ আর নেই।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রত্যেককে এই বিষয়টি উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। আর সেই সাথে চলুন আমরা সবাই পাঠ করি "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে ফিরো যাবো (২ : ১৫৭)। আমীন ॥

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

● কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

● মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

● পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

● ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

সংবাদ

বৈরাগীরচর হালকা মসজিদে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৯/১১/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুয়া সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা বৈরাগীরচর হালকা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। মজলিস আনসারুল্লাহ্ কটিয়াদীর ব্যবস্থাপনায় উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এম, এ, হান্নান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদী। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে নযম পাঠ, নবীজির জীবনী আলোচনার পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট

বিজ্ঞপ্তি

তালীম দফতর থেকে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালীম দফতর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১৩ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় পুরস্কার প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরুব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার সন্তান যদি এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৪ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আমাদের জন্য কষ্টকর।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালীম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ফাজিলপুর-এর প্রেসিডেন্ট জনাব শহীদ উল্যাহ গত ১৬/১১/২০১৩ গাছ থেকে পরে গিয়ে পায়ে আঘাত পায় এবং সাথে সাথে ফেনী সরকারী হাসপাতালে জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তারদের পরামর্শে অর্থোপেডিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় গত ১৮/১১/২০১৩ তারিখ রাত ৯-৪৫ মিনিটে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর। তিনি সরকারী চাকুরীজীবি ছিলেন (বিডিআর) ২০১২ সালে নিজ ইচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

তিনি একজন ওসীয়্যতকারী ছিলেন। সর্বদা চাঁদা এবং নামাযের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায বা-জামাত আদায় করার চেষ্টা করতেন। বড় নেক ও মেহমানদারী ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যেহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। সর্বদা জামা'তের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেন। সবাইকে ছালাম দিতেন ও হাসি মুখে কথা বলতেন। বলতে গেলে জামা'তের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাতের উচ্চ মোকামে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য এবং মরহুমের পরিবারবর্গকে ধৈর্য ধারণ ও নিরাপদ রাখেন সে জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার সদস্যা, সুন্দরবন জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম সামসুর রহমান টি. কে. সাহেবের সেঝ কন্যা মিসেস মনোয়ারা জিয়াদ গত ১১ নভেম্বর ২০১৩ সোমবার রাত ৮-৩০ মিনিটে ঢাকার মহাখালিস্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন সেন্টারে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ৮ নভেম্বর শুক্রবার সকালে তিনি খুলনা দারুল ফযলস্থ নিজ বাসায় ব্রেন স্ট্রোক করেন। এরপর ঐদিনই এম্বুলেন্সে ঢাকায় আনা হয় এবং শনিবার রাতে তার মাথায় অপারেশন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। মরহুমার নিয়মিত কুরআন পড়ার অভ্যাস ছিল।

তিনি স্বামী, দুই মেয়ে, তিন নাতনীসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জান্নাতের সুউচ্চ মোকামে সম্মানিত স্থান লাভের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীদের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পরিবারবর্গকে অসীম ধৈর্য ধারণ ও আহমদীয়াতের ছায়াতলে নিরাপদ রাখেন সেজন্যও সকলের নিকট আন্তরিকভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মুহাম্মদ জিয়াদ আলী

আন্তর্জাতিক জামাতি সংবাদ

কানাডার ক্যালগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী

কানাডার ক্যালগরী আহমদীয়া মুসলিম ছাত্রী সংগঠন গত ১৮ ও ১৯শে নভেম্বর ক্যালগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ক্যাম্পাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান ম্যাক্টন হলে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। কেননা, এখানেই ছাত্র-ছাত্রীদের সবচেয়ে বেশি সমাগম হয়।

প্রদর্শনীটি প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় এবং বহু লাজনা, খোদ্দাম ও আনসার অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এতে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সম্বলিত পোস্টার ও ফেস্টুনও প্রদর্শন করা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর খলীফাদের ছবি সম্বলিত বিশেষ এলাকাটি অতিথিদের মনোযোগ কাঁড়তে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলাম ও পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনে এরূপ মহতি উদ্যোগের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় ইসলামে নারীর অধিকার, জিহাদ ও আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি মূলক বক্তব্য প্রাধান্য পায় বলে জানা গেছে।

কানাডার ক্যাথলিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বাইতুন নূর মসজিদ পরিদর্শন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় গত ১২ই নভেম্বর কানাডাস্থ ক্যালগরী শহরের ক্যাথলিক স্কুলের ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ২ জন স্কুল স্টাফ আহমদীয়া মসজিদ বাইতুন নূর পরিদর্শনের সুযোগ লাভ করে। তাদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত করা হয় এবং শেষ যুগে যে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী আসার কথা সবধর্মে রয়েছে আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-যে এরই বাস্তবায়নে আবির্ভুত হয়েছেন, তা বিশদভাবে তুলে ধরা হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্বে কিবলা, নামায, কলেমা ইত্যাদিসহ ইসলামে জিহাদ ও নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জামাতের বই-পুস্তক উপহার দেয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আগত স্কুলের কর্মকর্তারা আহমদীয়া জামাতের আন্তরিক অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্থানীয় ক্যাথলিক স্কুল তাদের বিশ্বধর্ম শিক্ষার অংশ হিসেবে প্রতিবছর বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনায় পরিদর্শনের আয়োজন করে।

যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে গত ১৬ই নভেম্বর ২০১৩ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মহিলা সংগঠন লাজনা ইমাইল্লাহ্ 'এ টাইম অফ পিস' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানে শতাধিক নারী বর্তমান সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্য আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ১৩০ জনেরও বেশি অতিথি যোগদান করেন। লাজনার সদর মোহতরমা নাসিরা রহমান সাহেবা অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তিনি বলেন, বাইতুল ফুতুহ মসজিদের দরজা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সদা উন্মুক্ত।

তিনি আরো বলেন, কেন এ সান্ধ্য আয়োজনের নাম 'এ টাইম অফ পিস' রাখা হয়েছে। এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের করণীয় নির্ধারণ করা। বরং, মূলত সমাজে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজে আসতে পারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের সামনে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়। এ সংগঠনের মূল্যবোধ, তহবিল সংগ্রহ প্রক্রিয়া এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সঙ্গে এর সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম বক্তা ছিলেন মিতা জোশি, তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বী। বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন।

হিবাতুর রহমান আল্ জাবি সাহেবা সিরিয়ায় চলমান আন্তর্জাতিক সংঘাতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন যা উপস্থিত সুধীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

মার্টন কাউন্সিলের মেয়র 'ক্রিস্টাল মিলার' বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে তার উদ্যোগের কথা বলেন। তিনি বলেন, বাইতুল ফুতুহ মসজিদের ইমাম সাহেব পরবর্তী কাউন্সিল সভায় উদ্বোধনী প্রার্থনা পরিচালনা করবেন।

আহমদীয়া জামাতের অন্তরঙ্গ বন্ধু মার্টনের কাউন্সিলর 'ম্যাক্সি মার্টিন' আল জাবি সাহেবার হৃদয়গ্রাহী বক্তব্যের প্রশংসা করে বলেন, আহমদীয়া জামাতের স্লোগান- 'ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এর ভিত্তিতে আমাদের জীবন যাপনের চেষ্টা করা উচিত।

উক্ত অনুষ্ঠানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিনিধিত্ব করেন মাহা দাব্বুস সাহেবা। তিনি একজন চিন্তাবিদ, ভাষাবিদ ও মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার অন্যতম পরিচালক। তিনি শান্তি ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা তুলে ধরেন।

অতিথিরা মসজিদ কমপ্লেক্স পরিদর্শনের সময় লাইব্রেরি এবং বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নানা কর্মকান্ডের বিভিন্ন আলোকচিত্র দেখেন। অনেকেই এই অনুষ্ঠানের প্রশংসা করে বলেন, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান ও ধর্মাবলম্বী নারীদের এমন জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সত্যিই প্রশংসনীয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মহিলাদের এত বিশাল কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে পারা অনেক অতিথির কাছে ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা।

অতিথিরা বলেন, তারা আহমদীয়া জামা'তের কর্মকান্ডে নারীদের সম্পৃক্ততা ও ক্ষমতায়ন দেখে অভিভূত হন।

কেউ কেউ আলোচনা শুনে সিদ্ধান্ত নেন এখন থেকে তারাও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের পরিবার ও বন্ধু মহলে ছোট ছোট পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করবেন।

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-

ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;

খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং

গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবের্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করাবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদা তা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী।

কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুণরায় সজীব হবে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

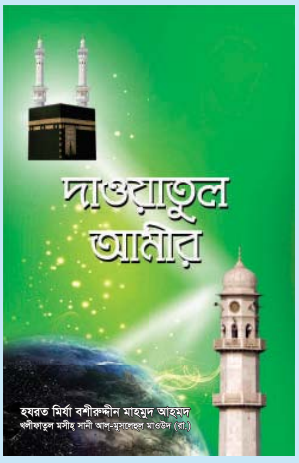

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

New Vol. No. 76 | 12 Issue

The Ahmadi

Fortnightly

31st December, 2013 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com